সূর্যের সপ্তম অশ্ব

আদান প্রদান

সূর্যের সপ্তম অশ্ব

ধর্মবীর ভারতী

অনুবাদ

মলয় রায়চৌধুরী
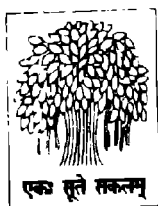
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

আধুনিক হিন্দি কথাসাহিত্যে ড. ধর্মবীর ভারতীর উপন্যাস 'সূর্যের সপ্তম অশ্ব' তার বিষয়-বস্তু, শিল্প-শৈলী এবং অভিব্যঞ্জনা-কৌশলের দৃষ্টিতে একটি অভিনব নিরীক্ষা। বৃহদায়তন না হওয়া সত্ত্বেও এই উপন্যাসে লেখক যে-বিষয়টি বক্তা এবং শ্রোতাগণের দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন তার ফলাফল বৃক্ষের বীজের মতন পরিপুষ্ট, সমৃদ্ধ এবং ঠাশবুনোট। এই কাহিনীর তাত্ত্বিক মর্ম হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমাজের আর্থিক অবস্থা এবং মানসিকতা খেয়াল রাখতে হবে।

ড. ধর্মবীর ভারতীর প্রথম উপন্যাস 'অপরাধের দেবতা' প্রকাশিত হবার সময়েও বেশ লোকপ্রিয় এবং আলোচিত ছিল। সমালোচকরা তাকে কিশোর মনের রোমাণ্টিক স্পন্দন আখ্যা দিয়ে প্রবীণতার সীমার বাইরে রাখতে চাইলেও, নিজস্ব চিত্তাকর্ষক বিষয়-বস্তুর কারণে তা আজও লোকপ্রিয়। 'সূর্যের সপ্তম অশ্ব' তার কাহিনী-কাঠামো, অভিব্যঞ্জনা, শিল্প-শৈলী ইত্যাদি সব দিক থেকেই 'অপরাধের দেবতা' থেকে পৃথক। ভাষাতেও কথাবার্তা বলার আঙ্গিকের গুরুত্ব। এছাড়া দার্শনিক পৃষ্ঠপটেও কোনও প্রকার মিল নেই। পরিবর্তনের কারণটির ইশারা নিজের পক্ষ থেকে লেখক স্বয়ং দিয়েছেন, 'ক্রমে-ক্রমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে দায়বদ্ধ সামাজিকতাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমি সততা সহ উন্মুখ থেকেছি। যা-কিছু আমি লিখি তাতে সামাজিক উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে কিন্তু তৎসহ তা স্বান্তঃ সুখায়ও বটে।' 'সূর্যের সপ্তম অশ্ব'-এর মূল বক্তব্যটি জানতে হলে লেখকের প্রাগুক্ত মন্তব্যটি মনে রাখা আবশ্যক।

'সূর্যের সপ্তম অশ্ব' পড়ার সময় পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে এই উপন্যাসটি আদপে পাঁচটি গল্পের সমবেত রূপ না কি সমন্বিত রূপে ব্যাপারটি উপন্যাস নির্মাণে একটি অভূতপূর্ব নিরীক্ষামাত্র। কাহিনী উপস্থাপনকারী ব্যক্তি মাণিক মুল্লা একজন সাংসারিক পুরুষ যে প্রেমের মাধ্যমে নিজেকে জানার চেষ্টা করে। তিনটি মেয়ের প্রেম-বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে প্রেমের মাধ্যমে সে তাদের জানার চেষ্টা করে। মাণিক মুল্লার বুদ্ধিবৃত্তি তার দ্বারা বর্ণিত গল্পগুলির মর্ম থেকে উদ্ঘাটিত হয়। বস্তুত সাতটি দুপুরের কালখণ্ড পৃথক-পৃথক দিকে ধাবিত হয়েও তা সাতটি গল্প নয় বরং সাতটি

আধারে একটি কাহিনী যা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উপন্যাস। নিজের সময়কালের জীবনযাত্রা এবং নিজের অনুভবসমূহ উপস্থাপনের জন্যে লেখক পৌরাণিক (সূর্যের সাতটি ঘোড়ার মিথ) প্রতীক গ্রহণ করেছেন। সব কয়টি গল্পই পরস্পর অনুগ্রথিত, সেহেতু কথাশিল্পের দৃষ্টিতে এটি অতিশয় ঠাশবুনোট, ছোট আয়তনের উৎকৃষ্ট উপন্যাস। আজকের বিসঙ্গতিপূর্ণ, নৈতিকতাবর্জিত, অনাচার, দম্ভ এবং ভণ্ডামীপূর্ণ জীবন এই গল্পগুলিতে সামগ্রিকভাবে ব্যঞ্জিত। মাণিক মুল্লার বনর্ণাশৈলী আকর্ষক। ব্যঙ্গ-আহ্লাদের ছিটেফোঁটা, বনর্ণাশৈলীকে করে তুলেছে সুশাব্য। গল্পের শেষে কোথাও-কোথাও নিষ্কর্ষবাদের সাহায্যে নিজের বক্তব্যকে প্রমাণসিদ্ধ করার চেষ্টাও লক্ষণীয়। গল্পগুলির বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ে মাণিক মুন্না নিজেই স্পষ্টীকরণ দিয়ে বলেছেন, "দেখো প্রকৃতপক্ষে এই গল্পগুলো প্রেম নয় বরং সেই জীবনকে আঁকে যা আজকের নিম্ন-মধ্যবিত্তরা অতিবাহিত করছে। তাতে প্রেমের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে আজকের আর্থিক সংঘর্ষ, নৈতিক বিশৃঙ্খলা, তাই এতো অনাচার, নিরাশা, তিক্ততা আর অন্ধকার ছেয়ে গেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে।"

এই উপন্যাসে পাঁচটি গল্প আছে। কাহিনীগুলোর কথক মাণিক মুল্লা। প্রথম গল্প (প্রথম দুপুর) লবণের উসুলি শিরোনামে লেখা হয়েছে। এই গল্পটি যমুনার, যে নিজের প্রেমিক তান্নাকে চাইলেও আর্থিক বৈষম্যের কারণে বিয়ে করতে পারে না তাকে। প্রেমের গল্প পড়ে প্রেমের যে-পরিভাষা সে জেনেছিল, তা নিজের জীবনে ঘটতে দেখলো সে। দ্বিতীয় গল্পটিও এই যমুনার, যার বিয়ে হল তেজবরের সঙ্গে আর সে বৃদ্ধও মারা গেলো। যমুনা বিধবা হয়ে টাঙা চালক রামধনের আশ্রয়ে থাকতে লাগলো। এই গল্পে ঘোড়ার নালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবদন্তীও প্যাঁচানো। তৃতীয় গল্প তান্নার। তান্না যুবাবস্থায় যমুনার প্রেমিক ছিল। তার সারাজীবন কেটেছে দুঃখকষ্টের মোকাবিলায় আর কেরানিগিরি করতে-করতে মারা যায়। লীলা, সেই মেয়েটি, যার সঙ্গে তান্নার বিবাহ হয়। এই গল্পে লীলার দুর্ভাগ্য পরিব্যাপ্ত। চতুর্থ গল্পটি মহেশ্বর দালাল আর মাণিক মুল্লায় আবদ্ধ। কাহিনীর উপশীর্ষক তো দেয়া হয়েছে 'মালবার যুবরানী দেবসেনার কাহিনী'। প্রকৃতপক্ষে এই উপশীর্ষক লেখকের মানসিকতার একটা ঝলক মেলে ধরে। স্কন্দগুপ্তের নাটকের দেবসেনার কথা লেখকের মনে উদয় হয় আর গুমোটের আবহাওয়ায় 'আহ বেদনা দিলে বিদায়'-এ মাণিক মুল্লার বোধ ঘুরে ফিরে আসে। মাণিক আর লীলার রোমান্টিক প্রেম, তৎসহ তান্নার সঙ্গে লীলার বিয়ে, বর্ণিত হয়েছে রোমান্টিক শৈলীতে।

পঞ্চম গল্পটিও বিয়োগান্তক প্রেমের কাহিনী যার শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'কালো বাঁটের ছুরি'। এই গল্পে কাহিনীর প্রণয়-প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে সূত্রধার মাণিককে জিজ্ঞেস করেছে যে গল্পগুলোয় তো কিঞ্চিদধিক টেকনিক থাকা দরকার।

যে রীতিতে মাণিক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তা লেখকের নিজস্ব অথবা

তা হিন্দির আরেকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক জৈনেন্দ্র-র আদলে। মাণিক বলেছে, "টেকনিক! হ্যাঁ টেকনিকের ওপর তারাই জোর দেয় যারা কোনও একটা ব্যাপারে অপরিপক্ক, যে তখনও অনুশীলন করছে, যে উচিত মাধ্যম খুঁজে পায়নি। তবুও টেকনিক সম্পর্কে চিন্তা করা সুস্থ প্রবৃত্তির লক্ষণ যদি না তা অনুপাতের থেকে বেশি হয়।"

এই গল্পটিতে চমন প্রামাণিকের (নাপিত) পালিত কন্যা সতীর সঙ্গে মাণিকের ঘনিষ্ঠতার বিবরণ আছে। চমন এবং মহেশ্বর দালাল আপাতদৃষ্টিতে সতীকে গলা টিপে হত্যা করে। এই বিয়োগান্তক গল্পটি প্রেম সম্পর্কে গূঢ় আলোকপাত করে। ষষ্ঠ দুপুরের গল্প কোনও নতুন চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটায় না কিন্তু মাণিকের মনোকষ্ট বর্ণনার পাশাপাশি চমন প্রামাণিক, সতী ও তার দুর্দশার প্রাণবন্ত ছবি আঁকে। ভিখিরির ঠেলাগাড়ির ওপর একটা ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সতী যাচ্ছিল, তখনই তার দিকে মাণিকের দৃষ্টি যায় আর সতীকে জীবিত দেখে মাণিকের হৃদয়ভার লাঘব হয় এবং মাণিক আর. এম.-এস. এর চাকরিতে যোগ দেয়। চাকরিতে উদ্ভূত ঝঞ্ঝাটের আকর্ষক বর্ণনা আছে।

সপ্তম অশ্বের গল্প না লিখে লেখক তাকে স্বপ্ন প্রেরণকারী ঘোড়া স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন দেখেছেন। সূর্যের ছয়টা ঘোড়াই তো ক্ষতবিক্ষত হয়ে রথ টানতে অসমর্থ। বেঁচেছে কেবল সপ্তম ঘোড়া, "যার ডানা অক্ষত রয়েছে, যে বুক ফুলিয়ে গ্রীবা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে। সেই ঘোড়া হলো ভবিষ্যতের ঘোড়া, তান্না, যমুনা আর সতীর কচি নিষ্পাপ শিশুদের ঘোড়া; যাদের জীবন আমাদের জীবনের থেকে অধিকতর শান্তির হবে, অধিকতর পবিত্রতার হবে, তাতে থাকবে অধিকতর আলো, থাকবে অধিকতর অমৃত। সেই সপ্তম অশ্বই আমাদের চোখের পাতায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর বর্তমানের নবীন নকশা পাঠায় যাতে আমরা সেই পথ গড়তে পারি যার ওপর দিয়ে আসবে ভবিষ্যতের ঘোড়া; যাতে তারা লিখতে পারে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় যার ওপর দিয়ে ছুটবে অশ্বমেধের দিগ্বিজয়ী ঘোড়া।... মাণিক মুল্লা বললেন যে... সপ্তম ঘোড়াটা তেজস্বী আর শৌর্যবান আর আমাদের দৃষ্টি আর আমাদের আস্থা তার ওপরেই থাকা উচিত।"

এই উপন্যাসে লেখক নিজের ভাবনা মাণিক মুল্লার গল্পে এমন কৌশলে অনুগ্রথিত করেছেন যে তা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কায়নের মাধ্যমে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়, আদর্শময় উপদেশ হিসেবে নয়। উপন্যাসটিতে অধ্যায়গুলোর মাঝে-মাঝে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পর ছোট ছোট নিষিদ্ধ পাঠ শিরোনামে চিন্তা-বিন্দু রাখা হয়েছে। চারটি নিষিদ্ধ পাঠে নিষ্কর্ষ হিসেবে দেয়া হয়েছে সঙ্কেত। প্রথম দুপুরের পরে লেখা নিষিদ্ধপাঠে যমুনার জীবন সম্পর্কে শ্যাম-এর সংলাপ, মেয়েদের জীবন-সংগ্রামে আলোকপাত করে। দ্বিতীয় দুপুরের

গল্পের নিষিদ্ধপাঠেও উপস্থাপিত হয়েছে যমুনার জীবনগাথার নাটকীয় বার্তালাপ। তৃতীয় দুপুরের শেষে বর্ণিত হয়েছে লেখকের নিজের দিবাস্বপ্নের-মতন-অসংলগ্ন চিন্তাধারার ক্রমপর্যায়। রামধন, যমুনা, তান্না আর তান্নার কাটা পা, তার ক্রন্দনরত শিশু। তৎসহ অজস্র ঘোড়ার নাল। ঘটিত ব্যাপারগুলোকে স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়ে লেখক ওই ঘটনাবলী এবং ব্যক্তিদের সঙ্কেতের মাধ্যমে পাঠককে যোগাচ্ছেন চিন্তার খোরাক। ষষ্ঠ দুপুরের নিষিদ্ধ পাঠটি এক ভয়ঙ্কর স্বপ্নই বটে যাতে মাণিক, লীলা, মহেশ্বর দালাল, চমন প্রামাণিক, যমুনার বাচ্চা, তান্নার বাচ্চা, সতীর বাচ্চা, চমন প্রামাণিকের কাটা হাত, তান্নার দুই কাটা পা ইত্যাদি। এই বীভৎস দৃশ্যে দেখা যায় মাংসপিণ্ডের ওপর উড্ডীয়মান চিল।

যদি এই চারটি নিষিদ্ধ পাঠের সত্ত্বগঠন নিয়ে ভাবা যায় তাহলে এই উপন্যাসের রহস্যময় মর্মার্থ অবগত হওয়া যেতে পারে। যা-কিছু সূক্ষ্মভাবে গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে তা নিষিদ্ধ পাঠগুলিতে আরও গূঢ়ভাবে দর্শানো হয়েছে সূত্রপ্রণালী রূপে। উপন্যাসশিল্পে এটি লেখকের সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা-প্রণয়ন। উপন্যাসটিতে মেয়েদের প্রেমপ্রসঙ্গে আছে বিয়োগাত্মক আভাস। যৌতুক, জাতিপ্রথা, বৃদ্ধবিবাহ, আর্থিক বৈষম্য, অতৃপ্ত যৌনতা ইত্যাদিতে পীড়িত মধ্যবিত্ত সমাজ আজ যে ধরনের সঙ্কটময় জীবন যাপন করছে তার ছবি আঁকতে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন ভারতী। এই ছোট-ছোট গল্পগুলি উপরিতলে হালকা মেজাজের প্রতিভাত হলেও কিন্তু তার সামান্য একটুখানি পরত সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলে যে নোংরামি এবং পঙ্ককর্দম নজরে পড়ে তা সত্যিই কেঁদে ফেলার মতন। উপন্যাসখানির আয়তন বেশ ছোট বটে কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে এতো বিশাল সমাজ বাস্তবতার ছবি আঁকার একমাত্র রহস্য হলো ওই বাস্তবকে অনুধাবন করতে পারা, যে সামাজিক জীবন লেখক যাপন করেছেন এবং লিখেছেন, তার সাথে গড়ে তুলেছেন নিকট সম্পর্ক, পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা।

গল্পগুলিতে আভাসিত হয় লেখকের লিখনভঙ্গীর দক্ষতা। 'সূর্যের সপ্তম অশ্ব'-এর গল্পগুলিকে যদি উপন্যাসে আঙ্গিকবদ্ধ না করে স্বতন্ত্ররূপে পাঠ করা হয় তাহলে পাঠকের দৃষ্টি এই গল্পগুলিতে কেবল প্রেম, পীড়া, করুণা এবং যৌনতার সীমায় নিবদ্ধ হয়। প্রথম গল্পের নায়িকা যমুনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তেজবরের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ে তো হয়ে গেলো কিন্তু নারীর প্রধান আকাঙ্ক্ষা মাতৃত্বের। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে রামধন টাঙাওলা প্রতিদিন সকালে বেড়াতে নিয়ে যায় যমুনাকে এবং ঘোড়ার নালের আঙটির অজুহাতে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে সফল হয়।

এই গল্পগলোয় প্রেমকে কেন্দ্র করে নারী চরিত্রগুলির যাতনা সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হয়। মাণিক তার নিজের ভঙ্গীতে প্রেমকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছে, "একথা সত্যি

যে প্রেম আর্থিক অবস্থার দ্বারা অনুশাসিত হয়, কিন্তু আমি যে উৎসাহের বশে বলেছিলুম যে প্রেম হলো আর্থিক নির্ভরতার আরেক নাম, তা কেবল আংশিক সত্য। এ ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে ভালোবাসা আত্মার অতলে ঘুমন্ত সৌন্দর্যের সঙ্গীতকে জাগায়, আমাদের, অন্তরে অদ্ভুত এক পবিত্রতা, নৈতিক নিষ্ঠা আর জ্যোতি ভরে দেয়।" মাণিক মুল্লাকে দিয়ে যে কথা প্রেম সম্পর্কে লেখক বলিয়েছেন তা লেখকের নিজস্ব মতামত। যে স্বপ্ন দেখছে (লেখক) মাণিক তাকে বলে যে, "যে প্রেম সমাজের প্রগতি এবং ব্যক্তির স্ফূরণের সহায়ক নয় তা নিরর্থক।"

স্কন্দগুপ্তের দেবসেনার প্রতি লেখকের আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় লিলির অবতারণায়। "মাণিক লিলির হাত টেনে নিলেন নিজের হাতে আর...বললেন আমি চাই আমার লিলি ঠিক সেরকমই পবিত্র, সেরকমই সূক্ষ্ম, সেরকমই দৃঢ় হোক যেমন ছিল দেবসেনা।" প্রেমের বিভিন্ন রূপের সন্দর্ভ উন্মোচন করে একটি নারী চরিত্র সতীর সৃজনও একটি পরিপূরক গল্প। সতীর গল্পটি বিচিত্র ; সে মাণিককে একজন বিশুদ্ধ মানব বলে মনে করে। তার মনে হয় যে এমন একজন মানুষ (মাণিক) আছে যার সমীপে তার আত্মা নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ। অবশ্য সতীর চরিত্রের সামগ্রিক সম্ভাবনা পরিস্ফুটিত হয়নি কাহিনীতে।

'সূর্যের সপ্তম অশ্ব"-এর পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে কাহিনী গঠনে অথবা বলার মানুষটি হলো মাণিক মুল্লা। অদৃষ্টের দোষ-দুষ্ট তান্না নিরপরাধ হলেও অপরাধীদের থেকেও নিকৃষ্ট জীবন যাপনকারী যুবক। মহেশ্বর দালাল একজন লম্পট, বখে-যাওয়া ধনী এবং অহংকারী পুরুষ। ক্ষুদ্র স্বার্থে লিপ্ত চমন প্রামাণিক একজন বিবেকভ্রষ্ট বজ্জাত মানুষ যার কোনও ভূমিকা নেই উপন্যাসটিতে। একটি অনামা চরিত্র আছে—আমি—যে কাহিনীটিতে মাণিক মুল্লার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং সমস্যা-সমাধানের টানা-ভরনা বুনে গল্পটিকে করে তোলে সুশ্রাব্য। লেখক এই গল্পগুলিতে মার্কসবাদ সম্পর্কে কোনও তর্কসাপেক্ষ মন্তব্য করেননি। বিষয়টিকে মাণিক মুল্লাও এড়িয়ে যায়। কোনও সন্দর্ভসূত্রে মার্কসবাদকে যদি বিবেচ্য বিষয় করে তোলা হতো তাহলে নিঃসন্দেহে তা এই গল্পগুলোয় কথোকথনের পরিবর্তে অনর্থক বিবাদসম্পদ প্রশ্ন হয়ে উঠতো।

'সূর্যের সপ্তম অশ্ব'-এর চরিত্রগুলিকে ঔপন্যাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কাহিনীতে সঙ্কুলিত করায় এই রচনাটি আধুনিক কালখণ্ডের পরস্পর-বিরোধীতায় প্রতিপালিত মধ্যবিত্ত সমাজের সংঘর্ষময় জীবনের প্রাণবন্ত ছবি এঁকেছে। অজ্ঞেয় তাঁর ভূমিকায় উপন্যাসটির বিষয়-আঙ্গিক-শিল্প এবং পাত্রপাত্রীর চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, "এই চিত্রাবলী সুন্দর, প্রীতিদায়ক ও সুখকর নয়, কেননা সমাজের জীবনই তেমন নয় এবং ভারতী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন

সত্যকে তুলে আনতে। যদিও তা অসুন্দর অথবা অপ্রীতিকরও নয় কেননা তা মৃত নয়। বা নয় মৃত্যুর পূজারী।” ভারতী তাঁর উপন্যাসে শেষ সপ্তম অধ্যায়ে নিজের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ব্যক্ত করেছেন সূর্যের সপ্তম ঘোড়া রূপে। যে আমাদের চোখের পাতায় পাঠায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন এবং বর্তমানের নবীন নকশা যাতে আমরা সেই পথ গড়ে তুলতে পারি যার ওপর দিয়ে আসবে ভবিষ্যতের অশ্ব।

ড. ধর্মবীর ভারতী সপ্তম অশ্বের মাধ্যমে সূর্যের যে রূপকে উপস্থাপিত করেছেন তা অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে যাবার, সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টাবার এবং শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধের পূনঃপ্রতিষ্ঠার সপ্তম অশ্ব। সূর্যের সাতটি ঘোড়ার পৌরাণিক প্রয়োগ মিথ-নির্ভর মনে হলেও, সূর্যকে যদিও সাতটি ঘোড়া টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু উপন্যাসে কাঁধ দিয়েছে ছয়টি গোড়া। “অথচ আমাদের শ্রেণী-বিভাজিত, অনৈতিক, ভ্রষ্ট আর অন্ধকার জীবনের গলিতে চলার ফলে সূর্যের রথ বেশ ভেঙেচুরে গেছে আর বেচারা ঘোড়াদের তো অবস্থা এমন যে কারুর লেজ কেটে গেছে তো কারুর ঠ্যাঙ ভেঙে গেছে, তো কেউ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে, তো কারুর খুর জখম হয়ে গেছে। এখন বেঁচে আছে কেবল একটাই ঘোড়া, যার ডানা অক্ষত রয়েছে, যে বুক ফুলিয়ে গ্রীবা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে। সেই ঘোড়া হলো ভবিষ্যতের ঘোড়া, তান্না, যমুনা আর সতীর কচি নিষ্পাপ শিশুদের ঘোড়া ; যাদের জীবন আমাদের জীবন থেকে অধিকতর শান্তিময় হবে।”

সংক্ষেপে, ‘সূর্যের সপ্তম অশ্ব’ উপন্যাসের প্রতিষ্ঠিত টেকনিক থেকে সরে গিয়ে লেখা। সমাজ বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা, চরিত্রগুলির গঠনে মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যঙ্গ-প্রমোদের মনোরম প্রসঙ্গের ঝলক, ভাষার ধ্বনি ও অর্থের সমন্বয়ী ব্যবহার এবং গল্পগুলিতে কেন্দ্রাতিগ চমৎকারিত্ব স্তম্ভিত করার মতন। সংক্ষেপে, এই উপন্যাস হিন্দি কথাসাহিত্যে একেবারে মৌলিক শৈলীর রচনা। আজ পর্যন্ত কোনও লেখক এই টেকনিকের অনুকরণ করেননি। আদর্শের মিথ্যা আকর্ষণে পথভ্রষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ এই বইটি পড়ে বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবেন। পরোক্ষের অনৈতিক আচরণ প্রত্যক্ষের আদলে সমাজ বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হবে।

অধ্যাপক বিজয়েন্দ্র স্নাতক

নিবেদন

'অপরাধের দেবতা'-র পর এটি আমার দ্বিতীয় রচনা। দুটি লেখাতেই কালানুক্রমের পার্থক্য ছাড়া সেই সমস্ত ব্যাপারেও পরিবর্তন ঘটেছে যেগুলোর মাধ্যমে আমি সমস্যার বিশ্লেষণ করেছি।

রচনাশৈলীও কিছুটা অভিনব, যা, যদিও-আদপে পুরোনো, কিন্তু ঠিক ততটুকু পুরোনো যাতে আজকের পাঠকের তা মনে হবে একটু নতুন কিংবা অপরিচিত। খুবই ছোটখাট কাঠামোর মধ্যে বেশ দীর্ঘ ঘটনাক্রম আর অনেক বিস্তৃত এলাকার ছবি আঁকার বাধ্যবাধকতার দরুণ এই আঙ্গিক গ্রহণ করতে হয়েছে।

কাহিনীগুলোয় আমার দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ ; কিন্তু এই সূত্রে এসে পড়া মার্কসবাদের প্রসঙ্গের কারণে কোনও শিবির থেকে বিতর্ক খাড়া করা হতে পারে। যাঁরা সত্যের প্রতি চোখ বন্ধ করে নিজেদের পক্ষকে ভুল অথবা সঠিক ভাবে প্রচার করাকে সমালোচনা মনে করেন, তাঁদের জন্যে আমার বলার কিছু নেই, কেননা সাহিত্যের উৎকর্ষে তাঁদের কোনও সৃজনশীল গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না ; তবে হ্যাঁ, যাঁদের মধ্যে সামান্য বোধশক্তি, সহানুভূতি আর পরিহাস-প্রিয়তা আছে তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই ঃ

গত তিন-চার বছরে মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশুনা করে আমি যতটুকু শান্তি, যতটা সাহস আর যতটা আশান্বিত হতে পেরেছি, হিন্দিতে মার্কসবাদী সমালোচনা আর চিন্তভাবনায় ততটা নিরাশ এবং অতৃপ্ত হয়েছি। নিজের সমাজ, নিজস্ব লোক-সংস্কৃতি আর তার ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব তা থেকে যে সারবস্তু সংগ্রহ হয় সে বিষয়ে অশ্রুপাত করা যেতে পারে কিংবা পেটে খিল ধরিয়ে হাসা যেতে পারে। তাছাড়া ত্রুটির প্রতি ইশারা করলে তাঁরা চটে যান, তা আরও হাস্যকর আর করুণ ব্যাপার।

এতৎসত্ত্বেও মার্কসবাদের প্রতি আমার আস্থা কখনও কম হয়নি আর জনতার দুঃখ-কষ্ট থেকে আমি বিচ্ছিন্ন করিনি নিজেকে। ক্রমশ নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে অধিকতর সমাজবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি সততাসহ আগ্রহান্বিত রয়েছি এবং থাকবো। আর সেই দৃষ্টি থেকে যখনই মার্কসবাদী শব্দজালের আড়ালে অসন্তোষ ও অহংকার ও গোষ্ঠী-প্রিয়তা আমার নজরে পড়েছে, সে সমস্ত সম্পর্কে স্পষ্ট মতামতের প্রয়োজন অনুভব করেছি আমি কেননা অমন মতাদর্শ আমাদের

জীবন ও আমাদের সংস্কৃতির সুস্থ উন্নয়নে সঙ্কট সৃষ্টি করে। আমি জানি, যে-মার্কসবাদী নিজের ব্যক্তিত্বে সামাজিক, এবং মার্কসবাদের প্রথম শর্ত অবজেকটিভিটি তাঁর চরিত্রে বিকশিত, তিনি আমার বক্তব্য অনুধাবন করবেন ; আমার প্রাপ্তির জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।

এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্যে শ্রী অজ্ঞেয় রাজি হয়েছেন, তার জন্যে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা শব্দে ব্যক্ত করা যাবে না। উনি আমার অন্তরের বিশ্বাস ও সততা সম্পর্কে অবগত আর আজকের যুগে একজন লেখক এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা চাইতে পারে! তিনি এই গ্রন্থের শৈলী ও বিষয়বস্তুর মর্মকে যে ভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। আমার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রশংসার বাক্য প্রয়োগ করেছেন, জানি না আমি তার উপযুক্ত কি না, কিন্তু আমি তা স্নেহাশীর্বাদ রূপে নতমস্তকে গ্রহণ করছি এবং চেষ্টা করছি যাতে তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। আমার পাঠকদের কাছ থেকে বেশ অভিনব আর ভালোবাসা-ভরা চিঠিপত্র পাই। সেগুলো আমার কাছে মূল্যবান রত্ন। তাঁদের আমি একটা কথা বলতে চাই—আমি লিখে-লিখে শিখিছি আর শিখতে-শিখতে লিখছি। যা কিছু লিখি তাতে সামাজিক উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে কিন্তু তা সুখানুভূতির জন্যেও বটে। আমার সুখে অবশ্যই আপনারা সবাই সম্মিলিত, আপনাদের সকলের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আমার নিজের ঃ সত্যি বলতে কি, এমন কোনও বিরাট বড়ো একটা গল্প আছে যা আমাদের সবাকার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে চলেছে। তারই একটা অংশ কেবল আমার কলম বেয়ে এসেছে। সুতরাং এর মধ্যে যা কিছু ভালো তা আপনাদের সবায়ের, রচনাটির যাবতীয় দুর্বলতাকে আমার নিজের বলে মনে করা হোক।

ধর্মবীর ভারতী

উপমুখবন্ধ

আপনাদের সমক্ষে মাণিক মুল্লার অদ্ভুত নিষ্কর্ষবাদী প্রেমের গল্পের আঙ্গিকে লেখা ‘সূর্যের সপ্তম অশ্ব’ নামের উপন্যাসটিকে আমি উপস্থাপনের আগে, ভালো হয় যদি আপনি জেনে নেন যে মাণিক মুল্লা কে ছিলেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কোথায় দেখা হল, কেমন করে তাঁর প্রেমের গল্পগুলো আমাদের সবায়ের সামনে এলো, প্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণা আর অভিজ্ঞতা কী ছিল, আর গল্পের টেকনিকের বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা কী ছিল।

‘ছিল’ এই জন্যে ব্যবহার করছি যে আমি জানি না আজকাল উনি কোথায় আছেন, কী করছেন, আর-কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি না ; আর সত্যিই যদি তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর সঙ্গে ওনার অদ্ভুত গল্পগুলো যাতে হারিয়ে না যায় তাই আমি এগুলো আপনাদের সামনে রাখছি।

এমন একদিন ছিল যখন উনি ছিলেন আমাদের পাড়ার একজন বিখ্যাত লোক। সেখানেই জন্মে ছিলেন, লায়েক হলেন, সেখানেই নামডাক হল আর উধাও হয়ে গেলেন সেখান থেকেই। আমাদের পাড়াটা বেশ বড়ো, নানান এলাকায় ভাগ করা আর উনি ছিলেন সেই অংশের বাসিন্দা যেটা সবচেয়ে বেশি রঙিন ও রহস্যময় আর যার নতুন ও পুরোনো দুই প্রজন্ম সম্পর্কে অদ্ভুত-অদ্ভুত সমস্ত কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

মুল্লা ওনার পদবি নয়, জাত ছিল। উনি ছিলেন কাশ্মিরী। কয়েক পুরুষ যাবত এখানে ওনাদের বসতি ছিল, উনি থাকতেন দাদা আর বৌদির সঙ্গে। দাদা আর বৌদির বদলি হয়ে গিয়েছিল আর পুরো বাড়িতে উনি একা থাকতেন। এতো সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আর এতো কমিউনিজম একসাথে ওনার বাড়িতে ছিল যে যদিও আমরা ওনার বাড়ি থেকে অনেকটা দুরে থাকতুম, কিন্তু সবায়ের আড্ডা জমতো সেখানেই। আমরা সবাই ওনাকে গুরুর মতন মনে করতুম আর আমাদের জন্যে ওনারও প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। উনি চাকরি করেন না পড়েন, যদিবা চাকরি করেন তো তা কোথায়, যদি পড়াশুনা করেন তাহলে কী পড়েন— এ সমস্তও আমরা জানতে পারিনি কখনও। ওনার ঘরে বইপত্রের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। হ্যাঁ, কিছু বিদঘুটে ধরণের জিনিস সেখানে থাকতো যা সাধারণত অন্য লোকেদের বাড়িতে পাওয়া যায় না। যেমন, দেয়ালে একটা পুরোনো কালো ফ্রেমে ফোটো

বাঁধানো ছিল ঃ 'খাওদাও, গতর বানাও!' এক জায়গায় তাকের ওপর কালো বাঁটের বড়সড় সুন্দর ছুরি রাখা থাকতো, এক কোণে পড়ে থাকতো ঘোড়ার খুরের পুরোনো নাল আর অমনধারা সব কিম্ভূতকিমাকার জিনিস, যার প্রয়োজনীয়তা আমরা কখনও ঠাহর করে উঠতে পারিনি। এছাড়া যে ব্যাপারে আমাদের বেশি আগ্রহ ছিল তা হল এই যে শীতকালের দিনে চিনেবাদাম আর গরমকালে তরমুজ সব সময় ওখানে রাখা থাকত যার স্বাভাবিক পরিণাম ছিল যে আমরাও সদাসর্বদা সেখানে হাজির থাকতুম।

হাতে যদি অফুরন্ত সময় থাকে, সারা বাড়িটা থাকে যদি আপনার অধিকারে, দুচারজন বন্ধুবান্ধব বসে থাকেন, তাহলে কথাবার্তা ঘুরেফিরে পৌঁছোবে রাজনীতিতে আর যখন রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ ফুরোবার মুখে, তখন জমায়েতের কথাবার্তা গিয়ে পৌঁছোবে 'প্রেমে।' অন্তত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে এদুটো বিষয় বাদ দিয়ে তৃতীয় বিষয় আর নেই। মাণিক মুল্লার দখল যতোটা রাজনীতিতে ছিল ততোটাই ছিল প্রেমে, কিন্তু সাহিত্যিক আলোচনার প্রশ্নে উনি প্রেমকে গুরুত্ব দিতেন।

প্রেমের বিষয়ে কথা বলতে বলতে উনি অনেক সময়ে এমন অদ্ভুত ভাবে প্রবাদের ব্যবহার করতেন যে কেন কে জানে একটা প্রবাদ আজও আমার মাথায় থেকে গেছে, যদিও তার প্রকৃত অর্থ আমি সেদিনও বুঝিনি আর আজও বুঝি না। প্রায়ই প্রেমের ব্যাপারে নিজের ঝাল-মিষ্টি অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সবায়ের জ্ঞানবৃদ্ধির পর তরমুজ কাটতে কাটতে বলতেন, 'বুঝলে হে, প্রবাদে যা-ই থাকুক না কেন, প্রেমের ব্যাপারে তরমুজ ছুরির ওপর পড়ুক কিংবা ছুরি পড়ুক তরমুজের ওপর, ক্ষতি চিরকাল ছুরির হয়। তাই যার চরিত্র ছুরির মতন ধারালো আর ঋজু, তার উচিত যে-ভাবে হোক এই ঝুটঝামেলা এড়ানো।' এরকম এক গাদা প্রবাদ ছিল যেগুলো মনে পড়লে পরে বলব।

কিন্তু গল্পের ব্যাপারে ওনার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে যতরকম গল্পের প্রজাতি আছে তার মধ্যে প্রেমের গল্পই সবচেয়ে সফল হিসেবে প্রমাণিত, অতএব গল্পের মধ্যে রোমান্সের অংশ থাকা খুবই জরুরি। তবে সেই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ করা অনুচিত আর এমন কিছু বিস্ময়কর কাজ করা উচিত যা নিশ্চিতভাবে সমাজের কল্যাণে লাগবে।

আমরা যখন জানতে চাইতুম যে তা কী করে সম্ভব, যে গল্প লেখা হবে প্রেমের অথচ তার প্রভাব হবে কল্যাণমূলক তখন উনি বলতেন যে এটাই তো তোমাদের মাণিক মুল্লার কারসাজি যা আর অন্য কোনও গল্প লেখকের একেবারেই নেই।

যদিও তখনও পর্যন্ত উনি একটাও গল্প লেখেননি, তবু গল্প রচনার বিষয়ে ওনার অগাধ পড়াশোনা ছিল (অন্তত আমাদের তো সেরকমই লাগতো) আর কথা-শিল্পের ওপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল।

গল্পের টেকনিকের বিষয়ে তাঁর প্রথম মতামত ছিল যে আধুনিক গল্পের আরম্ভ, মধ্য কিংবা শেষ, তিনটের মধ্যে কোনও একটা তত্ত্ব অবশ্যই ছেড়ে যায়। এমনটা হওয়া উচিত নয়। তিনি বলতেন যে সেই গল্পই ভরাট যার আরম্ভে থাকে আরম্ভ, মধ্যে থাকে মধ্য আর শেষকালে থাকে শেষ। উনি এভাবে তার ব্যাখ্যা দিতেন ঃ আরম্ভ বলে তাকে যার আগে কিছু নেই। তারপর থাকবে মধ্য, মধ্য তাকে বলা হবে যার আগে থাকবে আরম্ভ আর পরে থাকবে শেষ। শেষ তাকে বলা হবে যার আগে থাকবে মধ্য আর পরে থাকবে বাজে কাগজের ঝুড়ি।

গল্পের টেকনিক সম্পর্কে ওঁর দ্বিতীয় মত ছিল যে গল্প রোমান্টিক হোক বা প্রগতিবাদী, ইতিহাস-আশ্রয়ী হোক বা অনৈতিহাসিক, সমাজবাদী হোক বা মুসলিমলিগি, কিন্তু তা থেকে কোনও না কোনও নিষ্কর্ষ অবশ্যই বেরোনো উচিত। সে নিষ্কর্ষ কিন্তু সমাজের পক্ষে উপকারী হওয়া দরকার এরকম স্থির সিদ্ধান্ত ছিল ওনার আর সেই জন্যেই যদিও উনি সারা জীবনে কোনও গল্প লেখেননি তবু নিজেকে মনে করতেন কথাসাহিত্যে নিষ্কর্ষবাদের প্রবর্তক। কথা-শিল্পের সম্পূর্ণ কাঠামো উনি এভাবে দিতেন ঃ

কিছু চরিত্র নাও, আর প্রথম থেকে একটা নিষ্কর্ষ ঠিক করে রাখো, যেমন...মানে যে নিষ্কর্ষই বের করা হোক না কেন, তারপর চরিত্রগুলোর ওপর নিজের কর্তৃত্ব এমন কায়েম করো, এতোটা তাঁবে রাখো যে তারা নিজে থেকে প্রেমের ঘূর্ণিতে জড়িয়ে পড়ে আর শেষ কালে তারা সেই একই নিষ্কর্ষে পৌঁছোয় যা তুমি আগে থাকতে ভেবে রেখেছো।

আমার মনে প্রায়ই এই কথাগুলো সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিতো, কিন্তু নিষ্কর্ষবাদের বিষয়ে উনি আমাকে বলেছিলেন যে হিন্দিতে বহু গল্প লেখক এই জন্যে বিখ্যাত যে তাঁদের গল্পের প্লট খোঁড়ালেও, চরিত্রগুলো ক্যাবলা হলেও, সামাজিক আর রাজনৈতিক নিষ্কর্ষ থাকতো অদ্ভুত।

আমার দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল বিষয়বস্তুতে প্রেমের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। আমি প্রায়ই ভাবতুম যে জীবনে বেশি থেকে বেশি দশ বছর মোটে এমন হয় যখন আমরা প্রেম করি। সেই দশ বছরে খাওয়া-পরা, আর্থিক লড়াই, সামাজিক জীবন, পড়াশুনা, বেড়িয়ে বেড়ানো, সিনেমা আর সাপ্তাহিক পত্রিকা, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি থেকে যতোটা সময় বাঁচে, সেটুকুতে আমরা প্রেম করি। তবুও তাকে অতো গুরুত্ব দেয় কেন? ভ্রমণ, আবিষ্কার, শিকার, ব্যায়াম, মোটর গাড়ি চালানো, রোজগারপাতি, টাঙাঅলা, এক্কাগাড়ি-অলা আর পত্রিকার সম্পাদক, হাজার বিষয় আছে যা নিয়ে গল্প লেখা যেতে পারে, সুতরাং প্রেম নিয়েই বা কেন লেখা?

যখন আমি মাণিক মুল্লাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করলুম তখন উনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন আর বললেন, "তুমি বাংলা জানো?" আমি বললুম, "না, কেন?"

তো গভীর নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "রবীন্দ্রনাথের নাম শুনছো নিশ্চই! উনি লিখেছেন, 'আমার মাঝারে যে আছে সে গো কোনো বিরহিনী নারী! তার মানে আমার মনের মধ্যে যে রয়েছে সে কেউ একজন বিরহিনী নারী। আর ওই বিরহিনী নারী নিজের কাহিনী বলতে থাকে—বারংবার নানাভাবে।" আর তারপর নিজের মতামত ব্যাখ্যা করে উনি বললেন যে বিরহিনী নারীও হয় অনেক রকম—অবিবাহিতা বিরহিনী, বিবাহিতা বিরহিনী, মুগ্ধ বিরহিনী, প্রৌঢ়া বিরহিনী ইত্যাদি, আর বিরহও হয় অনেক রকম—বাহ্য-পরিস্থিতিনির্ভর, আন্তরিক-মনস্থিতিনির্ভর ইত্যাদি। এই সবগুলো নিয়ে গল্প লেখা যায় ; আর মাণিক মুল্লার বাহাদুরি এই ছিল যে যাদুকর যেমন নিজের মুখের ভেতর থেকে আম বের করে, ঠিক তেমনিই এই সমস্ত গল্প থেকে সামাজিক কল্যাণের নিষ্কর্ষ বের করতে পারতেন উনি।

যদিও মাণিক মুল্লা সম্পর্কে প্রকাশের বক্তব্য ছিল যে, "আরে বুঝলি, হিন্দির অন্য সব গল্প লেখকদের মতন মাণিক মুল্লারও নারী সম্পর্কে কিছু 'অবসেশান' আছে!" কিন্তু একথা মাণিক মুল্লার সামনে বলার সাহস ও কখনও দেখায়নি যাতে উনি কথাটার সঠিক উত্তর দিতে পারেন আর আমার নিজের কথা যদি বলতে হয়, আমি আজ পর্যন্ত ওনার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারিনি। তাইজন্যে এই গল্পগুলো আমি যেমনকার তেমনি আপনাদের সামনে রাখছি, যাতে আপনি নিজেই নির্ণয় নিতে পারেন। এর নাম 'সূর্যের সপ্তম অশ্ব' কেন রাখা হয়েছে তাও শেষ পর্যায়ে খোলশা করে দিয়েছি আমি।

তবে হ্যাঁ, আপনি আমাকে এইজন্যে ক্ষমা করে দেবেন যে এর শৈলীতে কথা বলার ঢঙের প্রাধান্য আর আমার অভ্যাস অনুযায়ী এর ভাষা রোমাণ্টিক, চিত্ররূপময়, রামধনু আর ফুলে সাজানো নয়। তার প্রধান কারণ হল যে এই গল্পগুলো মাণিক মুল্লার, আমি তো কেবল প্রস্তুতকর্তা, অতএব ঠিক যেমনটা শুনেছি তাঁর মুখে যথাসম্ভব তেমনই উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি।

প্রথম দুপুর

লবণের উসুলি

অর্থাৎ যমুনার লবণ মাণিক কেমন করে উসুল করেছিল

প্রথম গল্পটা উনি একদিন গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা শুনিয়েছিলেন যখন লু লাগবার ভয়ে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে মাথার তলায় ভিজে তোয়ালে রেখে আমরা চুপচাপ শুয়েছিলুম। প্রকাশ আর ওঙ্কার তাস পিটছিল আর আমি অভ্যাসবশত কোনও বই পড়ার চেষ্টা করছিলুম। মাণিক আমার বইটা কেড়ে ফেলে দিলেন আর গুরুজনের ঢঙে বললেন, "এই ছোঁড়াটা একেবারে নিষ্কর্মা বেরোবে। আমার ঘরে বসে অন্যের গল্প পড়ে। বল, কটা গল্প শুনতে চাস।" সকলেই উঠে বসলো আর মাণিক মুল্লাকে গল্প বলার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলো। শেষকালে মাণিক মুল্লা একটা গল্প শোনালেন যার মধ্যে ওঁর বক্তব্য অনুযায়ী উনি এর বিশ্লেষণ করেছিলেন যে প্রেম নামের ভাবনা কোনও রহস্যময়, আধ্যাত্মিক কিংবা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ভাবনা নয় বরং বাস্তবে তা পুরোপুরি একটি সামাজিক ভাবনা, অতএব তা সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর তার ভিত দাঁড়িয়ে থাকে আর্থিক কাঠামো আর শ্রেণী সম্পর্কের ওপর।

নিয়ম মতন প্রথম উনি গল্পের শিরোনামটা জানালেনঃ লবণের উসুলি। এই শিরোনামের ওপর উপন্যাস-সম্রাট প্রেমচন্দ-র 'লবণের দারোগা'-র বেশ প্রভাব আছে মনে হয়েছিল কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল একেবারে মৌলিক। গল্পটা ছিল এরকম—

মাণিক মুল্লার বাড়ির পাশে একটা পুরোনো পাকাবাড়ি ছিল যার পেছন দিকে ছিল একটা ছোট উঠোন। উঠোনে থাকতো একটা গরু আর পাকাবাড়িতে এক মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল যমুনা, গরুটার নাম জানা নেই। গরুটা ছিল বুড়ি, গায়ের রঙ লাল, শিঙ ছুঁচালো। মেয়েটির বয়েস ছিল পনেরো, গায়ের রঙ গমের মতো উজ্জ্বল, স্বভাবে মিষ্টি, হাসিখুশি আর চঞ্চল। মাণিক, যাঁর বয়েস তখন মাত্র দশ, মেয়েটিকে যমুনিয়াঁ বলে ডেকে পালাতেন আর সে বড়ো হবার অজুহাতে যখনই ধরে ফেলতে পারতো মাণিককে, কান দুটো মলে দিতো আর যেখানে সেখানে চিমটি কেটে সারা গা লাল করে দিতো। নিস্তারের কোনও পথ না পেয়ে মাণিক মুল্লা চেঁচাতেন, মাফ চাইতেন আর পালাতেন।

কিন্তু যমুনার দুটো কাজ ছিল মাণিক মুল্লার দায়িত্বে। এলাহাবাদ থেকে যতোরকমের প্রেমের গল্পের সস্তা পত্রিকা প্রকাশিত হতো সে সব যমুনা ওনাকে

দিয়েই আনাতো আর শহরের কোনও সিনেমাহলে যদি নতুন ফিল্ম আসতো তো তার গানের বইও কিনে আনতে হতো মাণিককে। এভাবে যমুনার গার্হস্থ্য পাঠাগার দিনে দিনে ফেঁপে উঠছিল।

সময় কাটতে কতোই বা বিলম্ব হয়। গল্প পড়তে-পড়তে আর সিনেমার গান মুখস্ত করতে-করতে যমুনা কুড়ি বছরের হয়ে গেল আর মাণিক পনেরো বছরের, আর ঈশ্বরের মায়া দেখো যে যমুনার বিয়ে পাকা হল না কোথাও। কথাবার্তা হচ্ছিল বটে। পাশের বাড়ির মহেশ্বর দালালের ছেলে তান্নার বিষয়ে পাড়ার সবাই বলতো যে যমুনার বিয়ে ওর সঙ্গেই হবে, কেননা তান্না আর যমুনার মধ্যে বেশ মিল ছিল, তান্না তো যমুনার জাতেরই, যদিও একটু নিচু গোত্রের ছিল আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল যে সারাটা পাড়া ভয় পেতো মহেশ্বর দালালকে। মহেশ্বর ছিল বড়োই ঝগড়াটে, দাম্ভিক আর লম্পট, তান্না ততোই সরল, বিনয়ী আর সৎ ; আর পাড়ার সবাই ওর গুণকীর্তন করতো।

কিন্তু একটু আগে যেমন বলা হয়েছে যে তান্না ছিল সামান্য নিচু গোত্রের, আর যমুনার বংশগৌরব জ্ঞাতিদের মধ্যে কুলিন আর উঁচু হিসেবে বিখ্যাত ছিল তাই যমুনার মায়ের মত ছিল না। যমুনার বাবা ব্যাঙ্কে একজন সাধারণ কেরানি ছিলেন বলে আর মাসমাইনে দিয়ে কী-ই বা হয়, পুজো-পরব, ব্রত-উৎসবে প্রতি বছর জমানো টাকা খরচ করতে হতো, তাই গত যুদ্ধের সময়ে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যেমন হয়েছিল, অনেক তাড়াতাড়ি জমানো টাকাকড়ি পুরো খরচ হয়ে গেল আর বিয়ের জন্যে কানা কড়িও বাঁচলো না।

তান্নার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে যেতে অনেক কেঁদেছিল বেচারি যমুনা, অনেক কেঁদেছিল। তারপর চোখের জল পুঁছেছিল, ফের সিনেমার নতুন গান মুখস্থ করেছিল। আর এভাবে কুড়ি বছর বয়েসও পেরিয়ে গেল একদিন। আর মাণিকের অবস্থা এমন যে যেমন-যেমন যমুনা বড়ো হতে লাগলো তেমন-তেমন ও এখানে-সেখানে রোগা-মোটা হতে লাগলো আর তা মাণিকের ভালোও লাগতো আবার খারাপও। কিন্তু এমন এক বদভ্যাস ওর হয়ে গিয়েছিল যে মাণিক মুল্লা ওকে বিরক্ত করুক বা না করুক একলা কোণঠাশা পেলেই এমন খামচাতো যে মাণিক মুল্লার দম বন্ধ হবার যোগাড় আর তাই মাণিক মুল্লা ওর ছায়া দেখেও সিঁটিয়ে যেতেন।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস দেখুন ঠিক সেই সময়ে পাড়ায় শুরু হয়ে গেল ধর্মের ঢেউ আর বৌরা একধার থেকে, যাদের মেয়েদের বিয়ে হয়নি, যাদের স্বামী হাত থেকে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল, যাদের ছেলেরা চলে গিয়েছিল যুদ্ধে লড়াই করতে, যাদের গয়নাগাটি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, যাদের ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল অনেক ; সবাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলো আর কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেলো। আর কণ্ঠি পরা

হতে লাগলো। মাণিকের বৌদিও হনুমান চবুতারার ব্রহ্মচারীর কাছে মন্তর নিলেন আর নিয়মিত দুবেলা ভোগ রাঁধতে লাগলেন। সকাল সন্ধে প্রথম রুটিটা গোমাতার নামে সেঁকতে লাগলেন। বাড়িতে গরু তো ছিল না তাই পাকাবাড়ির বুড়ি গরুকে সেই রুটি খাওয়ানো হতো দুবেলা। দুপুরবেলা তো মাণিক স্কুলে চলে যেতেন, দিনের বেলা বলে বৌদি নিজে চাদর ঢাকা দিয়ে গরুকে রুটি খাইয়ে আসতেন কিন্তু রাতের বেলায় যেতে হতো মাণিক মুল্লাকেই।

গরুটার কাছে উঠোনে যেতে মাণিক মুল্লার আত্মা কেঁপে উঠতো। যমুনার কান মূলে দেয়াটা একেবারে পছন্দ ছিল না ওর (আবার ভালও লাগতো)! তাই ভয়ের চোটে রামনাম জপতে জপতে ডগমগ আনন্দে এগিয়ে যেতেন গরুর উঠোনে।

একদিন হল কি মাণিক মুল্লার বাড়িতে অতিথি এসেছিল আর খাওয়া-দাওয়া সারতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। মাণিক শুয়ে পড়ায় ওকে ঘুম থেকে তুলে বৌদি রুটি দিয়ে বললেন, "গরুটাকে দিয়ে আয়"। মাণিক নানা ভাবে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পারলেন না। শেষকালে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠোনের কাছাকাছি পৌঁছে দেখেন, গরুটার পাশের খোলভুষো রাখার ঘরের দরোজায় কোনও ছায়ামূর্তি শবাচ্ছাদনের মতন শাদা পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁর তো হৃৎপিণ্ড একেবারে মুখে উঠে আসার জোগাড়, কিন্তু উনি শুনেছিলেন যে ভূতপ্রেতের সামনে মানুষকে সাহস ভর করে থাকতে হয় আর ওদের দিকে পেছন ফেরা ঠিক নয় নইলে তক্ষুনি মানুষ প্রাণে মারা পড়ে।

মাণিক মুল্লা বুক ফুলিয়ে আর কাঁপতে-কাঁপতে ঠ্যাঙ সামলে এগোলেন আর মেয়েমানুষটা উধাও হয়ে গেল সেখানে থেকে। উনি বারবার চোখ রগড়ে দেখলেন, কেউ নেই ওখানে। উনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, গরুকে রুটি খাইয়ে ফিরছিলেন। তখন তাঁর মনে হল যে কেউ ওনার নাম ধরে ডাকছে। মাণিক মুল্লা বেশ ভালভাবে জানতেন ভূতপ্রেতরা পাড়ার সমস্ত ছেলের নাম জানে, তাই দাঁড়িয়ে পড়া উচিত হবে না মনে হল ওনার। কিন্তু কণ্ঠস্বর কাছে আসছিল আর হঠাৎ কেউ একজন পেছন থেকে এসে মাণিক মুল্লার জামার কলার খামচে ধরলো। মাণিক মুল্লা হাঁক দিয়ে চেঁচাতেই যাচ্ছিলেন কি কেউ একজন হাত রেখে দিলে ওনার মুখের ওপর। স্পর্শটা পরিচিত ছিল ওনার। যমুনা!

যমুনা কিন্তু কান মলেনি। বললে, "চলে এসো"। মাণিক মুল্লার অসহায় অবস্থা। চুপচাপ এগোলেন আর বসে পড়লেন। এবার মাণিকও নির্বাক আর যমুনাও নির্বাক। মাণিক চেয়ে থাকেন যমুনার দিকে, যমুনা চেয়ে থাকে মাণিকের দিকে আর গরুটা চেয়ে থাকে ওদের দুজনের দিকে। একটুক্ষণ পরে মাণিক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "আমাকে যেতে দাও যমুনা"! যমুনা বললে, "বসে থাকো, মাণিক কথা বলো। মন বড়ো অস্থির"।

মাণিক আবার বসে পড়েন। কথা কইতে হলে কী কথাই বা বলবেন? ওনার ক্লাসে সে সময়ে ভূগোলে 'সুয়েজ খাল', ইতিহাসে 'সম্রাট জালালুদ্দিন আকবর', হিন্দিতে 'ইত্যাদির আত্মকথা' আর ইংরেজিতে 'রেড রাইডিং হুড' পড়ানো হচ্ছিল। কিন্তু এসম্পর্কে কী কথাবার্তাই বা বলা যায় যমুনার সঙ্গে! কিছুক্ষণ পর মাণিক ক্লান্ত হয়ে বললেন, "আমাকে যেতে দাও যমুনা, ঘুম পাচ্ছে"।

"কী এমন রাত হয়েছে এখন। বোসো"! কান ধরে বললে যমুনা। মাণিক ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "ঘুম পায়নি, খিদে পাচ্ছে"।

"খিদে পাচ্ছে? আচ্ছা, যেও না যেন! আমি আসছি এক্ষুনি"। কথাগুলো বলে যমুনা পেছন দিকের খিড়কি দরোজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। মাণিক ঠাহর করতে পারলেন না যে আজ যমুনা হঠাৎ এমন দয়ালু হয়ে উঠেছে কেন, ঠিক তখনই যমুনা ফিরে এলো আর আঁচলের চাপা সরিয়ে দুচারটে লুচি বের করে বললে, "নাও খাও। আজকে তো মা ভাগবতপাঠ শুনতে গেছে"। আর যমুনা আগের মতই মাণিককে নিজের কাছে টেনে লুচি খাওয়াতে লাগলো।

একটা লুচি খেয়েই মাণিক মুল্লা উঠে দাঁড়াতে যমুনা বললে, "আরো খাও"। তো মাণিক মুল্লা ওকে জানান যে মিষ্টি লুচি ওঁর ভাল লাগে না, বেসনের নোনতা লুচি ওঁর ভাল লাগে।

"আচ্ছা কালকে তোমার জন্যে বেসনের লুচি ভেজে রাখবো। আসবে কালকে? ভাগবতপাঠ তো সাতদিন ধরে হবে"। মাণিক বাঁচলেন হাঁফ ছেড়ে। উঠে দাঁড়ান। ফিরে এসে দেখলেন বৌদি শুয়ে পড়েছে। মাণিক মুল্লা চুপচাপ গোমাতার ধ্যান করতে-করতে শুয়ে পড়লেন।

পরের দিন মাণিক মুল্লা যাবার চেষ্টা করলেন, কেননা ওঁর যেতেও ভয় করছিল আবার চাইছিলেনও যেতে। আর কে জানে কী একটা ব্যাপার ছিল যা ভেতরে-ভেতরে ওঁকে বলছিল, "মাণিক! এটা বেশ খারাপ জিনিস ঘটছে। যমুনা ভালো মেয়ে নয়।" আর ওরই অন্তরে দ্বিতীয় কিছু একটা ছিল যা বলছিল, "চলো মাণিক! তোমার আর মন্দ কী হবে। চলো দেখা যাক ব্যাপারটা কী?" আর এদুটোর চেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল নোনতা বেসনের লুচি যার জন্যে অবুঝ মাণিক মুল্লা নিজের ইহলোক-পরলোক দুই-ই নষ্ট করতে রাজি ছিলেন।

সেদিন মাণিক মুল্লা যেতে যমুনা পরেছিল সবুজ রঙের ভয়েলের শাড়ি, অরগ্যাণ্ডির ফিনফিনে ব্লাউজ, দুটো বিনুনি বেঁধেছিল, কপালে পরেছিল ঝিলমিলে টিপ। মাণিক প্রায়ই দেখতেন যে মেয়েরা যখন স্কুলে যায় তো এরকম সেজেগুজে যায়, বাড়িতে তো নোংরা কাপড় পরে মেঝেয় বসে গল্প গুজব করে, তাই ওঁর অবাক লাগলো। বললেন, "যমুনা, এখন স্কুল থেকে ফিরছো বুঝি?"

"স্কুল? স্কুলে যাওয়া তো মা চার বছর হলো ছাড়িয়ে দিয়েছে"। বাড়িতে

বসে-বসে হয় গল্প পড়ি নইলে ঘুমোই।" মাণিক মুল্লা বুঝতে পারছিলেন না যে সারাদিন যদি শুয়েই থাকতে হবে তো এমন সাজগোজ করার দরকারটা কী। মাণিক মুল্লা আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে দেখছিলেন বলে যমুনা বলল, "চোখ ড্যাবড্যাব করে কী দেখছো! জার্মানির আসল অরগ্যাণ্ডি। কাকা এনে দিয়েছিল কলকাতা থেকে, বিয়ের জন্যে রাখা ছিল। এই দেখো ছোট-ছোট ফুল তোলা।"

মাণিক মুল্লার ওই অরগ্যাণ্ডি ছুঁয়ে আশ্চর্য লাগলো, যেটা কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল, আসল জার্মানির ছিল আর যার জমিতে ছোট ছোট ফুলের নকশা ছিল।

মাণিক মুল্লার যখন গরুকে রুটি খাওয়ানো শেষ হলো তখন যমুনা বেসনের নোনতা লুচি বের করলো। কিন্তু বললে, "প্রথমে বোসো তাহলে খাওয়াবো।" মাণিক চুপচাপ এগোন। যমুনা ছোট টর্চ জ্বাললো কিন্তু মাণিক ভয়ে কাঁপছিলেন। ওঁর সব সময় মনে হচ্ছিল ঝাঁপির মধ্যে থেকে এবার সাপ বেরোলো বলে, এবার তেঁতুল বিছে বেরোবে, এবার কাঁকড়া বিছে। কণ্ঠরুদ্ধ গলায় বললেন, "আমি খাবো না। আমায় যেতে দাও।"

যমুনা বললো, "কয়েত বেলের চাটনিও আছে।" এবার মাণিক মুল্লা বাধ্য হলেন। কয়েত বেল ওঁর ছিল বিশেষ প্রিয়। শেষ কালে সাপ-বিছের ভয় কোনও রকমে সামলে বসে পড়লেন। ফের ঐ একই অবস্থা, যমুনার দিকে মাণিক চুপচাপ তাকান, আর মাণিকের দিকে যমুনা আর গরু এদের দুজনকে। যমুনা বললে, "কথাবার্তা বলো, মাণিক।" যমুনা চাইছিল যে মাণিক ওর কাপড়ের বিষয়ে কথাবার্তা বলে, কিন্তু যখন মাণিক বুঝতে পারলেন না তখন ও নিজেই বললো, "মাণিক, এই কাপড়টা ভালো?" "খুবই ভালো যমুনা!" মাণিক বললেন। "আর দ্যাখো, তান্না আছে না, ওই যে আমাদের তান্না। ওর সঙ্গেই যখন কথাবার্তা এগোচ্ছিল তখনই কাকা কলকাতা থেকে এনে দিয়েছিল এইসব কাপড়। পাঁচশো টাকার কাপড় ছিল। পঞ্চম স্যাকরার কাছে এক সেট বাঁধা রেখে এনেছিল কাপড়, তারপর সম্বন্ধ ভেঙে গেল। এখন তো আমি ওর কাছেই গিয়েছিলুম"। একাএকা মন বড়ো উদ্বেল হয়। কিন্তু এখন তো কথাও বলে না তান্না। সেই জন্যেই কাপড় পালটে ছিলুম।"

"সম্বন্ধ কেন ভেঙে গেল যমুনা?"

"আরে তান্নাটা মহা ভীতু। আমি তো মাকে রাজি করিয়ে নিয়েছিলুম কিন্তু তান্নাকে মহেশ্বর দালাল ভীষণ বকলো। তখন থেকে তান্না ভয় পেয়ে গেলো আর এখন তো তান্না ভালো করে কথাও বলে না।" মাণিক কথার উত্তর না দেয়ায় যমুনা বললে, "আসলে তান্না খারাপ নয় কিন্তু মহেশ্বর লোকটা মহা বজ্জাত আর যবে থেকে তান্নার মা মারা গেছে তবে থেকে বড়ো মনমরা থাকে তান্না।" তারপর আচমকা যমুনা কণ্ঠস্বর বদলে বললো, "তাহলে কেন তান্না আমায় আশায়-আশায় রেখেছিল? মাণিক, এখন তো আমার খাওয়া-দাওয়াও ভালো লাগেনা।

স্কুলে যাওয়াও ছেড়ে গেছে। সারাদিন কান্নাকাটি করে কাটে। হ্যাঁ, মাণিক।" আর তারপর ও বসে পড়লো চুপচাপ। মাণিক বললেন, "তান্না বেশ ভীতু। খুবই ভুল করেছে ও।" তো যমুনা বললে, "পৃথিবীতে এরকমই হয়ে এসেছে।" আর উদাহরণ দিয়ে অনেকগুলো গল্প শোনালো যেগুলো ও পড়েছিল কিংবা দেখেছিল সিনেমায়।

মাণিক উঠে দাঁড়াতে যমুনা জিজ্ঞেস করলে, "রোজ আসবে তো!" মাণিক গাঁইগুঁই করতে যমুনা বললে, "দ্যাখো মাণিক, তুমি নুন খেয়েছো আর নুন খেয়ে যে শোধ দেয় না তার অনেক পাপ হয় কেননা ভগবান ওপর থেকে নজর রাখে আর সমস্ত কিছু লিখে রাখে খাতায়।" মাণিক নিরুপায় হয়ে গেলেন আর যেতে হতো প্রতিদিন আর যমুনা ওঁকে বসিয়ে রেখে তান্নার গল্প করতো।

"তারপর কী হলো।" আমরা সবাই জানতে চাইলে মাণিক বললেন, "একদিন ও তান্নার কথা বলতে-বলতে আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে অনেক কাঁদলো, অনেক কাঁদলো আর থামলো তো চোখের জল পুঁছে আমাকে হঠাৎ সেইসব কথাবার্তা বলতে লাগলো যেমন গল্পকাহিনীতে লেখা থাকে। আমার বেশ খারাপ লাগলো আর ভাবলুম কক্ষনো ওই দিকে যাবো না, কিন্তু নুন খেয়েছিলুম আমি আর ওপর থেকে ভগবান সবকিছু দেখতে পান। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে যমুনা কেঁদে ফেলতে আমি চাইছিলুম যে ওকে আমার স্কুলের গল্প বলি, আমার বইপত্রের কথা বলে ওর মন ভোলাই। কিন্তু ও চোখের জল পুঁছে গল্প-কাহিনীর মতন কথা বলতে লাগলো। এমনকি একদিন আমার মুখ থেকেও অমন কথাবার্তা বেরিয়ে গেল।"

"তারপর কী হলো?" আমরা জিজ্ঞেস করলুম।

"অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। আসলে এদের বুঝতে পারা বেশ কঠিন। যমুনা চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো আর ফের কাঁদতে লাগলো। বললো, "আমি খুব খারাপ মেয়ে। আমার মন উদ্বেল থাকতো বলে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসি, কিন্তু আমি তোমার ক্ষতি চাই না। আর আমি আসবো না।" কিন্তু পরের দিন যখন আমি গেলুম দেখলুম সে-ই দাঁড়িয়ে আছে যমুনা।

ফের মাণিক মুল্লাকে প্রতিদিন যেতে হলো। এক দিন, দুদিন, তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন—এমনকি আমরা বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলুম যে শেষ পর্যন্ত হলোটা কী তো মাণিক মুল্লা বললেন, "কিচ্ছু নয়, হবে আবার কী?" যখনই আমি যাই আমার মনে হয় কেউ বলছে মাণিক ওদিকে যেও না—এই পথ খুবই খারাপ, কিন্তু আমি জানতুম আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আর ক্রমে ক্রমে আমি টের পেলুম যে, আমি ওখানে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত করতে পারি না, যমুনার না আসা পর্যন্ত।"

"হ্যাঁ, তা তো বুঝলুম কিন্তু এর শেষটায় কী হলো?"

"শেষটায় কী হলো?" মাণিক মুল্লা টিটকিরি-মারা কণ্ঠে বললেন, "তাহলে তো তোমরা অনেক নাম কিনবে। আরে প্রেমের গল্পের আবার দুচার-রকম শেষ হয় নাকি। একই রকম তো শেষ হয়—নায়িকার বিয়ে হয়ে গেলো, মাণিক হাঁ করে দেখতে থেকে গেলেন। এবার এটাকেই যতোরকম ভাবে বলতে চাও বলো।

যাহোক এমন আকর্ষক গল্পের এতো সাধারণ পরিণাম আমাদের পছন্দ হলো না।

তবুও প্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু এ থেকে কী করে প্রমাণ হয় যে প্রেমানুভূতির ভিত্তি নির্ভর করে আর্থিক সম্পর্কের ওপর আর শ্রেণী সংঘর্ষ তাকে প্রভাবিত করে।"

"কেন? ব্যাপারটা তো একেবারে পরিষ্কার"। মাণিক মুল্লা বললেন, "যদি প্রত্যেকের বাড়িতে গরু থাকতো তাহলে এই পরিস্থিতি কেমন করে উদ্ভব হতো? সম্পত্তির বৈষম্যই এই প্রেমের মূল কারণ। যদি ওদের বাড়িতে গরু না থাকতো, আমায় যেতে হতো না, নুন খেতে হতো না, নুন খেয়ে শোধ করতে হতো না।"

"কিন্তু তবে এ থেকে সামাজিক কল্যাণের জন্যে কী নিষ্কর্ষ বেরোলো?" আমরা জিজ্ঞেস করলুম।

"বন্ধুগণ, নিষ্কর্ষ ছাড়া আমি কিছু বলি না! এ থেকে এই নিষ্কর্ষ বেরোলো যে প্রতিটি বাড়িতে একটা গরু থাকা দরকার যাতে রাষ্ট্রের পশু সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়, সন্তানদের স্বাস্থ্যও ভালো হয়। প্রতিবেশীদেরও উপকার হয় আর ভারতবর্ষে আবার দুধ-ঘিয়ের নদী বয়।"

যদিও আমরা আর্থিক ভিত্তির তত্ত্বটার সঙ্গে একমত ছিলুম না, কিন্তু এই নিষ্কর্ষ আমাদের সবায়ের পছন্দ হলো আর আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম যে বড়ো হয়ে এক-একটা গরু অবশ্যই রাখবো।

এভাবে মাণিক মুল্লার প্রথম নিষ্কর্ষবাদী প্রেমের গল্প শেষ হলো।

নিষিদ্ধ পাঠ

এই কাহিনীটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রভাবিত করেছিল। গ্রীষ্মের দিন। পাড়াটার যেদিকে আমরা থাকতুম সেদিকটায় ছাদগুলো তেতে থাকতো, আমারা তাই সবাই মিলে বদ্যি ডাক্তারের চবুতারায় শুতুম।'

রাত্তিরে আমরা যখন শুলুম তখন ঘুম আসছিল না আর থেকে-থেকে যমুনার গল্প আমাদের মাথায় ঘুরঘুর করতো আর কখনও কলকাতার অরগ্যাণ্ডি আর কখনও বা বেসনের লুচি মনে করে হাসাহাসি করছিলুম আমরা।

ইতিমধ্যে হাতে বাঁশের খাটিয়া আর বগলে বালিশ সতরঞ্চি নিয়ে শ্যাম উপস্থিত হলো। দুপুরের আড্ডায় ও হাজির ছিল না বলে আমাদের হাসতে দেখে কৌতুহলী হলো আর জিজ্ঞেস করলো যে মাণিক মুল্লা আমাদের কী গল্প শুনিয়েছেন। আমরা যখন ওকে যমুনার গল্পটা বললুম তো দেখে অবাক লাগরো যে হাসার বদলে ও আনমনা হয়ে গেল। আমরা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম যে, "আরে শ্যাম, এই গল্প শুনে তুমি মন খারাপ করে নিলে কেন? তুমি কি যমুনাকে জানো নাকি?" তো শ্যাম ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বললো, "না, আমি যমুনাকে জানি না, কিন্তু আজ শত করা নব্বুই ভাগ মেয়ে যমুনার অবস্থায় রয়েছে। বেচারিরা কি-ই বা করবে! তান্নার সঙ্গে ওর বিয়ে সম্বব হলো না, ওর বাপ যৌতুকের টাকা যোগাড় করতে পারলো না, শিক্ষা আর মন ভোলাবার জন্যে ওর জুটলো 'মিষ্টি গল্প', 'সত্য কাহিনী', 'রসালো গল্প', তো বেচারি আর কী-ই বা করতে পারতো! এটা তো কাঁদবার ব্যাপার, এতে আবার হাসাহাসির কী আছে। অন্যের সম্পর্কে হাসা উচিত নয়। সব বাড়িতেই মাটির উনুন হয়, ইত্যাদি।"

শ্যামের কথা শুনে আমাদের মন খারাপ হয়ে গেলো। আর আমরা সবাই শুয়ে-শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

দ্বিতীয় দুপুর

ঘোড়ার নাল

অর্থাৎ কেমন করে ঘোড়ার নাল সৌভাগ্যের লক্ষণ প্রমাণিত হলো

দ্বিতীয় দিন খাওয়া-দাওয়া করে আমরা সবাই ঐ বৈঠকে একত্রিত হলুম আর আমাদের সঙ্গে শ্যামও এলো। আমরা যখন মাণিক মুল্লাকে বললুম যে শ্যাম যমুনার গল্প শুনে কাঁদতে শুরু করেছিল তো শ্যাম রেগেমেগে বললো, "আমি আবার কোথায় কাঁদছিলুম?" মাণিক মুল্লা হাসলের আর বললেন, "আমাদের জীবনের সামান্য পরত যদি তুলে দেখো তো চারিদিকে এতো নোংরামি আর জঞ্জাল লুকিয়ে আছে যে সত্যিই তাতে কান্না পায়। কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ, আমি তো এতো কেঁদেছি যে আর চোখে অশ্রু আসে না তাই বাধ্য হয়ে হাসতে হয়। আরেকটা ব্যাপার আছে—যারা ভাবপ্রবণ আর কেবল কাঁদে, তারা কান্নাকাটি করেই বেঁচে থাকে কিন্তু হাসতে শেখে তারা অনেক সময়ে হাসতে হাসতে জীবনটাকে পালটে ফেলে।"

তারপর তরমুজ কাটতে-কাটতে বললেন, "এসব কথা বাদ দাও। নাও আজকে জৌনপুরি তরমুজ খাও। এর সুগন্ধ তো দেখো। গোলাপও হার মানবে। কী শ্যাম? মুখ গোমড়া করে বসে আছো কেন? আরে মুখ গোমড়া করে কী হবে! আমি এখন তোমায় বলছি কেমন করে যমুনার বিয়ে হল।"

আমরা সেটা চাইছিলুমই শুনতে তাই একসঙ্গে বলে উঠলুম, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আজকে যমুনার বিয়ের গল্প হোক।" কিন্তু মাণিক মুল্লা বললেন, "না, প্রথমে তরমুজের খোসা বাইরে ফেলে এসো।" আমরা ঘর পরিষ্কার করলে মাণিক মুল্লা সবাইকে আরাম করে বসার হুকুম দিলেন, তাকের ওপর থেকে ঘোড়ার পুরোনো নাল পেড়ে আনলেন আর ওটা হাতে নিয়ে ওপরে তুলে বললেন, "এটা কী?"

"ঘোড়ার নাল।" আমরা সমস্বরে উত্তর দিলুম।

"ঠিক!" মাণিক মুল্লা যাদুকরের মতন অদ্ভুত ভাবে নালটাকে আঙুলে পাক খাইয়ে বললেন, "এই নালটা যমুনার বিবাহিত জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন। তোমরা জানতে চাইবে, কেমন করে? আমি বলছি খোলশা করে ব্যাপারটা।"

আর মাণিক মুল্লা খোলশা করে যা বললেন তা সংক্ষেপে এরকম:

যখন অনেক দিন পর্যন্ত যমুনার বিয়ে হলো না আর নিরাশ হয়ে ওর মা পুজো-আচ্চা করতে লাগলেন আর বাবা ব্যাঙ্কে ওভারটাইম করতে লাগলেন তখন একদিন হঠাৎ ওদের বাড়িতে দুর সম্পর্কের এক আত্মীয়া রামো বিবি এলেন আর উনি

কড়াইশুঁটি ছাড়াতে-ছাড়াতে বললেন, "হরে রামো হরে রামো। মেয়ের বাড়নতো দেখো। যেমন নাম তেমন কাজ। ভাদ্রমাসের যমুনা, দুকূল ভেঙে পড়ছে যেন।" আর তারপর মাথা নাবিয়ে মায়ের কানেকানে বললেন, "এর বিয়ে-টিয়ে এখনও ঠিক করলে না কোথাও?" মা যখন বললেন সবাইতো অনেক যৌতুক চাইছে, কোনও বেজাতে দেয়ার চেয়ে মা-বেটিতে বরং গলায় দড়ি দিয়ে কুঁয়োয় ঝাঁপ দেবো তো রামো বিবি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ইশ, কেমন করে এমন অশুভ কথা জিভে আনতে পারলে যমুনার মা! বলতে বাধলো না! আরে কুঁয়োয় পড়ুক তোমার শত্তুর, কুঁয়োয় পড়ুক আশপাশের লোক, কুঁয়োয় পড়ুক তান্না আর মহেশ্বর দালাল, অপরের সুখে যাদের বুক ফাটে।" যাহোক ব্যাপারটা হলো এই যে রামো বিবি তক্ষুনি নিজের পুঁটলি থেকে ভাইপোর ঠিকুজি বের করে দিয়ে বললেন, "মন্দ সময়ে মানুষই মানুষের কাজে আসে। যে কঠিন সময়ে কাজে আসে না সে তো মানুষের চেহারায় পশু। এই যে এ আমার ভায়ের ছেলে। বাড়িতে একমাত্তর লোক, না আছে শাশুড়ি না আছে শ্বশুর, না ননদ না ভাজ, বাড়িতে কোনও কিচাইন নেই। দাদু ওর নামে জমিজমা লিখে দিয়ে গেছে। বাড়িতে ঘোড়া আছে, টাঙা আছে। বনেদি নামকরা বংশ। মেয়ে একেবারে রানী-মহারানীর মতন আয়েশ করবে।"

সন্ধেবেলা যমুনার মা যখন খবরটা বাপকে জানালেন তো উনি সামনে থেকে খাবার থালা সরিয়ে দিয়ে বললেন, "ওর দুটো বৌ মরেছে। ছেলেটা তেজবরে। আমার চেয়ে মোটে চারপাঁচ বছরের ছোট।"

"থালাটা কেন সরালে? না খাবে তো আমার কি। আনছো না কেন খুঁজে? মেয়ের বয়েস যখন আমার সমান হতে চললো তখন এগারো বছরের ছেলে পাবে কোত্থেকে।" একথা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চাপান-উতোর হলো। শেষকালে স্ত্রী এক খিলি পান সেজে নিয়ে গিয়ে স্বামীকে বললেন, "ছেলে তেজবরে হয়েছে তো কী হয়েছে। পুরুষ মানুষ আর দেওয়াল—যতো জল খায় ততো মজবুত হয়।"

যমুনার দরোজায় যখন বরযাত্রীরা পৌঁছোলো তখন মাণিক মুল্লা তা দেখলেন আর উনি মজবুত দেয়ালের যে বর্ণনা দিলেন হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল আমাদের। যমুনা ওকে দেখে অনেক কাঁদলো, গয়নাগাটি পেয়ে অনেক আনন্দ হলো, যাবার সময়ে এমন অবস্থা যে চোখের জল আর থামে না আর হৃদয়ে আহ্লাদ আর থামে না।

যমুনা যখন বাপের বাড়ি এলো তখন ছেলে বেলাকার সব বন্ধুদের বাসায় গেলো। সর্বাঙ্গে গয়নার ওজন, শরীরের প্রতিটি 'রোম পুলকিত আর স্বামীর গুণগানে জিভের ক্লান্তি ছিল না। "আরে কামিনী, উনি তো এতো সরলমনা যে সামান্য

সাতপাঁচেও থাকেন না। যেন ছোট্ট একটা শিশু। প্রথম দুটো পক্ষের বাপের বাড়ির লোকেরা সারা সম্পত্তি লুটেপুটে খেয়ে গেছে, নইলে ঐশ্বর্য রাখার জায়গা ছিল না। আমি বলেছি যে এবার তোমার শালা-শালি এলে বাইরে থেকেই বিদেয় করে দেবো, দেখো তুমি। তো উনি বললেন, 'তুমি হলে বাড়ির কর্ত্রী, সকাল-বিকেল ডাল-ভাত দিয়ে দাও ব্যাস, আমার আর কী করার আছে।'

চব্বিশ ঘণ্টা তাকিয়ে থাকেন মুখের পানে। একটু কোথাও গেছি—ব্যাস্ শুনছো, হ্যাঁ গা শুনছো, কোথায় গেলে গো! আমার তো তিষ্টোবার যো নেই কামিনী! পাড়া-প্রতিবেশীরা দেখে দেখে হিংসেয় পুড়ে মরে। আমি ভেবে রেখেছি, যতো পুড়বি ততোই পোড়াবো। আমিও বেলায় দরোজা খুলি যখন সূর্য মাথার ওপর। আর এতো খেয়াল রাখেন যে আসার সময়ে আড়াইশো টাকা জোর করে রেখে দিলেন ট্রাঙ্কে। বললেন, 'আমার দিব্বি যদি না নিয়ে যাও।"

কিন্তু যমুনাকে তাড়াতাড়িই ফিরতে হলো শশুরবাড়ি কেন না একদিন ওর বাপ হয়রান অবস্থায় রাত আটটা নাগাদ ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে জানালে যে হিসেবে একশো সাতাশ টাকা তেরো আনা কম পড়ে গেছে, যদি কাল সকালে গিয়ে টাকাটা জমা না করে দিই তো গ্রেফতার হয়ে যাবো। একথা শুনতেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে গেল বাড়ি আর যমুনা ট্রাঙ্ক থেকে নোটের বাণ্ডিল বের করে টালির চালে গুঁজে দিলো আর মা যখন বললে, 'খুকি টাকাটা ধার দে!' তো মায়ের হাতে চাবিটা দিয়ে বললে, "দেখে নাও না, তোরঙ্গে দুচারটে দু-আনি পড়ে আছে।" কিন্তু যমুনা ভাবলো আজকে ঝামেলা এড়ানো গেছে বটে, তবে পাঁঠার মা আর কদ্দিনই বা শুভ চিন্তা করবে। আগেই তো এতো হাতিয়ে নিয়েছে এখন যদি মা-বাপকে হরির লুট দেয় তো ছেলেপুলের জন্যে কী বাঁচাবে? আরে মা-বাপ আর কদিন? নিজেকে তো ছেলেপুলের ওপরই নির্ভর করতে হবে, নয়কি!

গল্প বলতে-বলতে মাণিক মুল্লা এই জায়গাটায় থামলেন আর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, সব সময়ে মনে রাখবে যে নারী সবচে আগে একজন মা তারপর অন্য কিছু! এদের জন্মই এই জন্যে হয় যাতে মা হতে পারে। সৃষ্টির যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটাই তার মহত্ব। তোমরা দেখলে তো যে যমুনার মনে প্রথমে নিজের ছেলেপুলের খেয়াল এলো।

আচ্ছা। যমুনা নিজের আগামী ছেলেপুলের চিন্তায় চলে গেলো শ্বশুরবাড়ি আর সুখে থাকতে লাগলো। সত্যি বলতে কি, যমুনার গল্প এখানেই ফুরোয়।

"কিন্তু আপনি তো ঘোড়ার নাল দেখিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গ তো এলোই না?"

"ওহ্! আমি ভাবলুম দেখি তোমরা কতোটা মন দিয়ে শুনছো।" আর তারপর উনি ঐ নালের ঘটনাও বললেন।

আসলে যমুনার তেজবরে স্বামী মানে মজবুত দেওয়াল, আর যমুনার মধ্যে

ততোই পার্থক্য ছিল যতোটা পলেস্তারা ঝরে পড়া পুরোনো দেওয়াল আর প্রলেপ দেয়া তুলসি মঞ্চে। এধার ওধারের লোক এধার-ওধারের কথা বলতো কিন্তু মনে-প্রাণে যমুনা ছিল পতি-পরায়না। স্বামী যেমন ওর গয়না-কাপড়ের খেয়াল রাখতো তেমনিই ওকে এনে দিতো ভজনামৃত, গঙ্গামাহাত্ম্য, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থরত্ন। আর ও-ও রামচরিত মানস ইত্যাদি পড়ে লাভান্বিত হতো। হতে-হতে এমন হলো ধর্মের বীজ ওর মনে শেকড় ছড়িয়ে দিলে আর ভজন-কীর্তন, উপদেশ-সৎসঙ্গ এসবে মজে গেলো ওর মন আর এতোটাই মজে গেল যে সকাল-সন্ধে, দুপুর রাত ও বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়াতো। প্রতিদিন ওর হেঁসেলে সাধু-সন্ন্যাসীর ভোজন লেগে থাকতো আর সাধু-সন্ন্যাসীরাও এমন তপস্বী আর রূপবান যে মাথায় জ্যোতিমণ্ডলী প্রকাশিত হতো।

এমনিতে ওর ভক্তি ছিল নিষ্কাম কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীরা যখন ওকে 'সন্তানবতী হও' বলে আশীর্বাদ দিতেন তখন ও মনমরা হয়ে যেতো। ওর স্বামী অনেক বোঝাতো ওকে, "ওগো, এতো ভগবানের মায়া, এতে মন খারাপ করার কী আছে"? কিন্তু সন্তানের চিন্তা ছিল তারও কেননা এতো অগাধ সম্পত্তির জমিদারের কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। শেষকালে একদিন সে আর যমুনা দুজনে এক জ্যোতিষীর কাছে গেলো যে যমুনাকে বললো যে সারাটা কার্তিক মাস ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে মাচণ্ডীকে হলুদ ফুল আর ব্রাহ্মণদের ছোলা, যব আর সোনা দান করা উচিত।

এই অনুষ্ঠানের জন্যে তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলো যমুনা। কিন্তু অতো ভোরে যাবেই বা কার সঙ্গে। যমুনার স্বামী (জমিদার সায়েব)-কে সঙ্গে যাবার জন্যে বললো কিন্তু সে একজন বুড়ো মানুষ, সকালে সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লাগতেই তার কাশির বেগ আরম্ভ হয়ে যেতো। শেষে ঠিক হলো যে রামধন টাঙাঅলা বিকেলে তাড়াতাড়ি ছুটি নেবে আর ভোর বেলা চারটের সময়ে এসে টাঙা তৈার রাখবে।

যমুনা প্রতিদিন নিয়ম করে নাইতে লাগলো। কার্তিক মাসে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে আর ঘাট থেকে মন্দির পর্যন্ত ওকে কেবল একটা ফিনফিনে সিল্কের শাড়ি পরে ফুল দিতে যেতে হতো। ও থর-থর থর-থর কাঁপতো। একদিন ঠাণ্ডার চোটে ওর হাত-পা অবশ হবার যোগাড়। আর ও সেখানেই ঠাণ্ডা বালির ওপর বসে পড়লো আর বলতে গেলে রামধন যদি না ওকে এক লপ্তে তুলে টাঙায় বসিয়ে দিতো তাহলে ও সেখানে বসে-বসে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যেতো।

শেষে রামধন আর থাকতে পারলো না। একদিন ও বললো, "দিদিমণি, আপনি নিজের প্রাণ দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন কেন। এমন তপস্যা তো বোধহয় গৌরী-মাও করেননি। বড়ো-বড়ো জ্যোতিষীর কথা তো মানলেন এবার এই গরিবের কথা শুনে দেখুন।" যমুনা জানতে চাইলে ও বললো, "যে ঘোড়ার মাথায় শাদা

তেলক আছে, তার সামনের বাঁ পায়ের ক্ষয়ে-যাওয়া নাল চন্দ্রগ্রহণের সময়ে নিজের হাত থেকে বের করে তার আঙটি বানিয়ে পরলে সমস্ত মনস্কামনা পুরো হয়।"

কথাটা যমুনার মনে ধরলো না কারণ কে জানে চন্দ্রগ্রহণ কবে পড়বে। রামধন জানালো যে চন্দ্রগ্রহণ দুতিন দিন পরেই। কিন্তু মুশকিল হল যে নাল সবে নতুন লাগানো হয়েছে, সেটা তিন দিনের মধ্যে কী ভাবেই বা ক্ষইবে আর নতুনের কোনও প্রভাব হয় না।

"তাহলে কী করা যায় রামধন? তুমিই কোনও উপায় বের করো!"

"মালকিন, একটাই উপায় আছে।"

"কী?"

"টাঙা যদি রোজ অন্তত বারো মাইল চলে। কিন্তু মালিক তো কোথাও বেরোন না। আমাকে একা টাঙা নিয়ে যেতে দেবেন না উনি। আপনি যদি যান তো হতে পারে।"

"কিন্তু বারো মাইল আমি কোথায় বা যাবো?"

"কেন হুজুর! আপনি ভোর বেলায় আরেকটু আগে দুটো আড়াইটের সময়ে বেরিয়ে পড়ুন! গঙ্গার পাড়ে পাকা সড়ক আছে, বারো মাইলে বেড়িয়ে ঠিক টাইমে হাজির করে দেবো। তিন দিনেরই তো কথা।"

যমুনা রাজি হয়ে গেলো আর তিন দিন পর্যন্ত রোজ টাঙা চলে যেতো গঙ্গার পাড়ে। রামধনের অনুমান ঠিক বেরোলো আর তৃতীয় দিন চন্দ্রগ্রহণের সময়ে নাল খুলে আঙটি বানানো হলো আর আঙটির প্রতাপ দেখো যে জমিদার সায়েবের বাড়ি নহবত বসানো হলো আর নার্স পুরো একশো-এক টাকা বখশিস নিলো।

জমিদার বেচারা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল আর ব্যারামও ছিল নানান,উত্তরাধিকারী এসে গিয়েছিল তাই ভগবান ওকে নিজের দরবারে ডেকে নিলে। স্বামীর শোকে বুক চাপড়ে কাঁদলো যমুনা, চুড়ি কঙ্কণ ভাঙলো, খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করলো। শেষে প্রতিবেশীরা বোঝালো যে বাচ্চাটা ছোট, ওর মুখের দিকে তাকানো উচিত; যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কাল মহাপরাক্রমী। তার ওপর কারুর নিয়ন্ত্রণ খাটে না! প্রতিবেশীদের অনেক বোঝানোয় চোখের জল পুছলো যমুনা। ঘরদোর সামলালো। এতো বিশাল বাড়ি, বিধবা মহিলার পক্ষে একা থাকা অনুচিত, ও তাই রামধনকে একটা ঘরে থাকতে দিলো আর পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে লাগলো।

যমুনার গল্প শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সন্দেহ ছিল যে মাণিক মুল্লা এই ক্ষয়ে-যাওয়া নাল পেলেন কোত্থেকে, ওটার তো আঙটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন করতে জানা গেল যে একবার কোনও রেল যাত্রায় মাণিক মুল্লার সঙ্গে রামধনের দেখা। সিল্কের পাঞ্জাবি, পানের ডিবে, কী রোয়াব ওর! মাণিক মুল্লার সঙ্গে দেখা হতেই ও নিজের ভাগ্যোদয়ের পুরো গল্প শোনালো আর বললো যে সত্যিই ঘোড়ার

নালের অনেক প্রভাব হয়। আর তারপর ও একটা নাল পাঠিয়ে দিয়েছিল মাণিক মুল্লার কাছে, যদিও উনি তা থেকে আঙটি না বানিয়ে নিজের সংগ্রহে রেখে নিয়েছিলেন।

গল্প শোনাবার পর শ্যামের দিকে তাকিয়ে মাণিক মুল্লা বললেন, "দেখলে তো শ্যাম ঈশ্বর যা-কিছু করেন মঙ্গলের জন্যে করেন। শেষকালে কতো সুখ পেলো যমুনা। তুমি মিছিমিছি দুঃখ পাচ্ছিলে না কি? অ্যাঁ?"

শ্যাম আনন্দিত হয়ে স্বীকার করলো যে সত্যিই অকারণে দুঃখ বোধ করছিল। শেষে মাণিক মুল্লা বললেন, "কিন্তু এবার বলো এ থেকে নিষ্কর্ষ কী বেরোলো?"

আমাদের মধ্যে কেউ যখন বলতে পারলে না তখন উনি বললেন, এ থেকে এই নিষ্কর্ষ বেরোলো যে পৃথিবীতে কোনও শ্রম খারাপ নয়। কোনও কাজকে হীন দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় তা সে টাঙা চালানো হলেও।

আমাদের সবায়ের এই গল্পের অমন নিষ্কর্ষ ভালো লাগলো আর আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করলুম যে কখনও কোনওরকম সততাপূর্ণ শ্রম হীন দৃষ্টিতে দেখবো না তা সে যা-ই হোক না কেন।

এভাবে মাণিক মুল্লার দ্বিতীয় নিষ্কর্ষবাদী গল্প শেষ হলো।

নিষিদ্ধ পাঠ

যমুনার জীবন-কাহিনী শেষ হয়েছিল আর ওর জীবনের এরকম সুখপ্রদ সমাধান দেখে আমাদের তৃপ্তি হলো। এমন মনে হলো যে তাবৎ রসের পরিণতি শান্ত বা নির্বেদে হয় যেমন, ঠিক তেমনই ঐ অভাগিনীর জীবনের পুরো লড়াই আর কষ্টের পরিণতি মাতৃত্বের দ্বারা প্লাবিত, শান্ত, সমাহিত প্রদীপ শিখার মতন সতত প্রজ্বলিত, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক বৈধব্যে হলো।

রাত্তিরে আমরা যখন নিজের-নিজের খাটিয়া আর বিছানা নিয়ে বদ্যি ডাক্তারের উঠোনে জড়ো হলুম তখন যমুনার জীবন-কাহিনী ছেয়েছিল আমাদের সবায়ের মগজে আর তাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কথাবার্তা আর তর্ক-বিতর্ক হলো তার নাটকীয় বিবরণ এরকম ঃ

আমি ঃ (খাটিয়ায় বসে, বালিশ তুলে কোলে রাখতে-রাখতে) বুঝলে, গল্পটা বেশ জমাটি ছিল।

ওঙ্কার ঃ (হাই তুলতে-তুলতে) তা হবে।

প্রকাশ ঃ (পাশ ফিরে) কিন্তু তোমরা কি তার মানে বুঝতে পেরেছো?

শ্যাম ঃ (স্বতোৎসাহে) কেন, কী এমন কঠিন ভাষা ছিল তাতে?

প্রকাশ ঃ এটাই তো মাণিক মুল্লার বিশেষত্ব। একটু সতর্ক হয়ে যদি ওনার কথা বুঝে না এগোও তাহলে তক্ষুনি তোমার হাত ফসকে তত্ত্ব বেরিয়ে যাবে, ভাসা-ভাসা ভুশিমাল থাকবে হাতে। এখন বলো যে এই গল্পটা শুনে তোমাদের মনে কী ভাবনা জাগলো? তুমি বলো!

আমি ঃ (এই মনে করে যে এরকম সুযোগে একটু আলোচনা করাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক) বুঝলে, আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না যে মাণিক মুল্লা যমুনার মতন নায়িকার গল্প কেন বললেন? শকুন্তলার মতন সরল মনা কিংবা রাধার মতন পবিত্র নায়িকার প্রসঙ্গ তুলতেন, আর যদি আধুনিকতার কথা ওঠে তাহলে সুনীতার মতন সাহসী নায়িকার কথা পাড়তেন বা দেবসেনা, শেখরের শশী-টসি ধরণের বহু চরিত্র পাওয়া যেতো।

প্রকাশ ঃ (সক্রেটিসের মতন কণ্ঠস্বরে) কিন্তু এটা বলো যে জীবনে বেশিরভাগ নায়িকা যমুনার মতন পাওয়া যায়, নাকি রাধা আর সুধা আর গেসু আর সুনীতা আর দেবসেনার মতন?

আমি ঃ (চালাকি করে নিজেকে বাঁচিয়ে) কে জানে! নায়িকাদের ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই। এটা তো আপনিই বলতে পারেন।

শ্যাম ঃ আরে ভাই, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের চারিপাশে শতকরা নব্বই ভাগ লোকই যমুনা আর রামধনের মতন হয়, কিন্তু তাতে কি! গল্প লেখকের উচিত শিবত্বের ছবি আঁকো।

প্রকাশ ঃ তা ঠিক। কিন্তু কোনও জমাট-বাঁধা সরোবরে যদি আধ ইঞ্চি বরফ আর অতল জল থাকে আর সেখানে দাঁড়িয়ে একজন গাইড যদি তার ওপর দিয়ে আসতে-থাকা লোকজনদের আধ ইঞ্চির খবরটা জানায় কিন্তু তলাকার অতল জলের খবর না দেয় তো সে যাত্রীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে কি না?

আমি ঃ কেন নয়?

প্রকাশ ঃ আর বরফ ভাঙলে যাত্রীরা যদি জলে ডুবে যায় তো তার পাপ গাইডের হবে কি না!

শ্যাম ঃ নয়তো কি?

প্রকাশ ঃ ব্যাস, মাণিক মুল্লাও ঐ অতল জলের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যেখানে রয়েছে মৃত্যু, অন্ধকার রয়েছে, পাঁক রয়েছে, নোংরামি রয়েছে। হয় অন্য পথ খোঁজো নয়তো তলিয়ে যাও। কিন্তু কোনও কাজে লাগবে না ওপরে জমা আধ ইঞ্চি বরফ। এক দিকে নতুন প্রজন্মের এই রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ, এই আবেগপ্রবণতা আর অন্য দিকে বুড়োদের পচা আদর্শ আর অবৈজ্ঞানিক আত্মাভিমান স্রেফ ঐ আধ ইঞ্চি বরফ, যেটা লুকিয়ে রেখেছে জলের ভয়ঙ্কর গভীরতা।

ওঙ্কার ঃ (ক্লান্ত। ভাবে কখন এসব বক্তিমেবাজি শেষ হবে)

প্রকাশ ঃ (স্বতোৎসাহে বলতে থাকে) যমুনা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক জটিল সমস্যা। আর্থিক ভিত্তি ফোঁপরা হয়ে গেছে। সেই জন্যে বিয়ে, সংসার, প্রেম, সব কিছুর ভিত্তিই নড়ে গেছে। ছেয়ে গেছে অনৈতিকতা। কিন্তু সেদিকপানে চোখ বুজে আছে সবাই। আসলে সমগ্র জীবনের কাঠামো পালটে ফেলতে হবে।

আমি ঃ (বিরক্তিতে হাই তুলি।)

প্রকাশ ঃ কী হল? ঘুম পাচ্ছে তোমার? আমি কতো বার তোমায় বলেছি যে একটু পড়াশুনা করো। কেবলই উপন্যাস পড়ো দেখি। সিরিয়াস জিনিস পড়ো। সমাজের কাঠামো, তার প্রগতি, তার মর্মার্থ, নৈতিকতা, সাহিত্যের স্থান...

আমি ঃ (কথা থামিয়ে) আমি কি পড়িনি নাকি? তুমি পড়েছো নিজে? (এটা

দেখে যে প্রকাশের জ্ঞানের প্রভাব পড়ছে সবায়ের ওপর, আমিই বা কেন পেছনে থাকি) আমিও এর মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দিতে পারি—

প্রকাশ ঃ কী? কী ব্যাখ্যা দিতে পারো?

আমি ঃ (জেদের সঙ্গে) মার্কসবাদী!

ওঙ্কার ঃ আরে বাদ দাও এসব!

শ্যাম ঃ আমার ঘুম পাচ্ছে।

আমি ঃ দেখুন, আসলে এর মার্কসবাদী ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে। যমুনা হলো মানবতার প্রতীক, মধ্যবিত্ত (মাণিক মুল্লা) এবং সামন্ত শ্রেণী (জমিদার) তাকে উদ্ধার করতে অসফল হলো ; শেষকালে শ্রমিক শ্রেণী (রামধন) তাকে নতুন পথনির্দেশ দিলে।

প্রকাশ ঃ কী? (একটুক্ষণ নিশ্চুপ। তারপর কপাল চাপড়ে) বেচারা মার্কসবাদও এমন অভাগা বেরোলো যে সারা পৃথিবীতে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছে তাকে বিরাট-বিরাট রাহু গিলে ফেললে। তুমি তো কোন ছার, তার তো এমন-এমন ব্যাখ্যাকারী এখানে জুটেছে যে সেও নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কাঁদছে। (জোরে হাসে, আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে দেখে উদাসীন হয়ে যাই।)

বদ্যি ডাক্তারের বৌ ঃ (নেপথ্যে) আমি বলি কি এটা বাড়ির উঠোন না কি শাকসব্জির বাজার। যাকেই দেখো খাটিয়া বগলে নিয়ে পৌঁছে যায়। আদ্দেক রাত্তির ওব্দি বকবক বকবক! কাল থেকে সবকটাকে তাড়াও।

বদ্যি ঃ (নেপথ্যে কাঁপতে-থাকা বৃদ্ধ কণ্ঠস্বর) আরে ছেলে ছোকরার দল। হাসতে কইতে দাও। তোর নিজের ছেলেপুলে নেই তো অন্যদের পেছনে লাগিস কেন...(আমরা সবাই হাহাকারগ্রস্ত হই। আমি বেশ উদাসীন হয়ে শুয়ে পড়ি। নিমের গাছ থেকে ঘুমের পরিরা নেবে আসে, চোখের পালকে ছুম-ছুম ছুম-ছুম নাচতে-নাচতে।)

(যবনিকা-পতন)

তৃতীয় দুপুর

শিরোনাম মাণিক মুল্লা জানান নি

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা দেখলুম যে রাত থাকতেই হঠাৎ বাতাস একেবারে থেমে গেছে আর এতো গুমোট যে সকাল পাঁচটার সময়েও আমরা ঘামে জবজবে ছিলুম। উঠে অনেকক্ষণ সবাই চান করলুম কিন্তু গুমোট এতো বেশি ছিল যে কিছুই কাজে দিলো না। কে জানে এই শহরের বাইরেও এমন গুমোট হয় কিনা ; কিন্তু এখানে তো যেদিন এরকম গুমোট হয় সে দিন সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি অফিসে কেরানিরা কাজ করতে পারে না, সেকশান অফিসাররা বড়ো বাবুদের বকাঝকা করেন, বড়ো বাবু ছোট বাবুদের ওপর ঝাল মেটান, ছোটো বাবু তার বদলা নেন চাপরাসিদের ওপর আর চাপরাসিরা গালমন্দ করে জড়িয়ে পড়ে জল খাওয়াবার লোকদের সঙ্গে, ভিশতিঅলার সঙ্গে আর মালির সঙ্গে ; দোকানি মালপত্তর বিক্রি না করে গ্রাহকদের ভাগিয়ে দেয় আর রিকশাঅলা ভাড়া এমন চায় যাতে যাত্রীরা বিরক্ত হয়ে রিকশা না চাপে। আর এই গোটা সামাজিক হুলুসথুলুসের পেছনে কোনও ঐতিহাসিকদ্বান্দ্বিক প্রগতির তত্ত্বের বদলে থাকে কেবল তাপঙ্ক—টেম্পারেচার, গুমোট, একশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট!

কিন্তু এরকম গুমোট সত্ত্বেও মাণিক মুল্লার গল্প শোনার লোভ ছাড়তে পারছিলুম না আমরা। তাই সবাই মিলে নির্ধারিত সময়ে ওখানে একত্রিত হলুম আর দেখা হতে সবায়ের প্রতি শুভেচ্ছা জানানো হলো "আজকে বড্ডো গুমোট।"

"হ্যাঁ হে, বড়ো গুমোট ; ওফ্-ফোহ!"

কেবল প্রকাশ যখন এলো আর সবাই ওকে বললো যে আজ বড্ডো গুমোট তো প্লেটোর মতন মুখ করে ফিলজফি ঝেড়ে ঝললো (আমার এই ঝাঁঝালো মন্তব্যের জন্যে ক্ষমা করবেন। কাল রাত্তিরে মার্কসবাদ নিয়ে তর্কে ও আমাকে ছোট করেছিল আর সৎ সঙ্কীর্ণমনা মার্কসবাদীদের মতন তেড়েমেড়ে উঠেছিল আর আমি ভেবে রেখেছিলুম যে সঠিক কথা বললেও আমি ওর বিরোধিতা করবো), "বন্ধুগণ, গুমোট আমাদের সবায়ের জীবনেই ছেয়ে আছে, তার কাছে এটা কিছুই নয়। আমাদের মতন নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে এক ঝলক টাটকা হাওয়াও নেই। দম বন্ধ হয়ে গেলেও পাতা নড়ে না, রোদ্দুরের কাজ আলো দেয়া অথচ ও আমাদের ভয়ঙ্কর রকম ঝলসাচ্ছে আর হদিশ পাই না যে কী করি। কোনও

না কোনও ভাবে টাটকা আর নতুন হাওয়ার রেশ বওয়া দরকার। তা সে লু-বাতাসের ঝাপটা হোক না কেন।"

প্রকাশের এমন মূর্খতাপূর্ণ কথায় কেউ কিছু বললো না। (আমার মিথ্যে কথার জন্যে ক্ষমা করবেন কেন না মাণিক একথা জোর দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বললুম না যে আমি মনে-মনে ক্রুদ্ধ!)

যাকগে, তো মাণিক মুল্লা বললেন, "আমি যখন প্রেমের ওপর আর্থিক প্রভাবের কথা বলি তখন আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো যে আর্থিক কাঠামোটা আমাদের চেতনায় এমন অদ্ভুত প্রভাব ফেলে যে মনের সমগ্র ভাবনাগুলো তা থেকে মুক্ত হতে পারে না আর আমাদের মতন লোকেরা যারা না উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আর না নিম্নবিত্ত শ্রেণীর, তাদের কাছে খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ঐতিহ্য, মর্যাদাবোধ এতো বেশি পুরোনো আর বিষাক্ত হয়ে গেছে যে সব মিলিয়ে-মিশিয়ে আমাদের সবায়ের ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে আমরা কেবল যন্ত্র হয়ে টিকে থাকি। আমাদের অন্তরে উদার আর উন্নতমনা স্বপ্ন যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আর এক অদ্ভুত ধরণের জড়তা ছেয়ে থাকে আমাদের।"

প্রকাশ যখন এর সমর্থন করলো তখন আমি তার বিরোধিতা করে বললুম, 'কিন্তু একজন মানুষের তো সব রকম অবস্থায় সৎ থাকা দরকার। এমন নয় যে ভেঙে-চুরে এগোবে।"

তো মাণিক মুল্লা বললেন, "সে কথা সত্যি, তবে যে ক্ষেত্রে পুরো ব্যবস্থাটায় অসততা রয়েছে সেক্ষেত্রে একজন মানুষের সততা এইতেই যে ওই ব্যবস্থার চাপিয়ে দেয়া সারাটা নৈতিক বিকৃতিকেও সে অস্বীকার করুক এমনকি তার চাপানো মিথ্যে মর্যাদাবোধকেও, কেন না এদুটো হলো টাকার এপিঠ-ওপিঠ। কিন্তু অমন বিদ্রোহ আমরা করে উঠতে পারি না, তার ফল এই হয় যে যমুনার মতনই প্রতিটি পরিস্থিতিতে মিটমাট করে নিতে থাকি।"

"কিন্তু সবাই তো আর যমুনা নয়?" আমি কথার পিঠে বললুম।

"তা বটে, কিন্তু যে এই নৈতিক বিকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেও এই পুরো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে না, তার আত্মমর্যাদা বোধ স্রেফ পরিশীলিত কাপুরুষতা বই কিছু নয়। অভ্যাসের অন্ধ অনুসরণ! আর এরকম মানুষদের ভালো লোক বলা হয়, কিন্তু তাদের জীবন বড়োই করুণ আর ভয়াবহ হয়ে যায় আর সবচেয়ে বড়ো দুঃখের কথা হলো যে সে লোকটাও তার জীবনের এই পৃষ্ঠপট টের পায় না আর কলুর বলদের মতন পাক খেয়ে মরে। উদাহরণের জন্যে তান্নার গল্পটা বলি তোমাদের? তান্নাকে মনে আছে তো? সেই যে মহেশ্বর দালালের ছেলে!"

সবাই খামোকা তর্ক-বিতর্কে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল তাই মাণিক মুল্লা গল্প শোনানো আরম্ভ করলেন—

ওঙ্কার হঠাৎ মাঝপথে থামিয়ে বললো, "এই গল্পের শিরোনাম?" মাণিক মুল্লা এরকম ব্যাঘাত ঘটায়, তেড়েমেড়ে উঠলেন আর বললেন, "আরে ছাড়ো দিকিনি, আমি কি কোনও পত্রিকায় গল্প পাঠাচ্ছি নাকি যে শিরোনাম নিয়ে চিন্তিত হবো। তোমরা সব গল্প শুনতে এসেছো না শিরোনাম শুনতে? না কি আমি সেই গল্প লেখকদের মতন যারা আকর্ষক বিষয়-বস্তুর অভাবে আকর্ষক শিরোনাম দিয়ে কাগজের সম্পাদক আর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে!"

মাণিক মুল্লা ওঙ্কারকে বকুনি দিচ্ছেন দেখে আমরাও সবাই ওঙ্কারকে বকুনি দিতে লাগলুম। এমনকি মাণিক মুল্লা যখন আমাদেরও বকাঝকা আরম্ভ করলেন তখন আমরা চুপ করে গেলুম আর উনি নিজের গল্প বলা আরম্ভ করলেন—

তান্নার কোনও ভাই ছিল না। কিন্তু বোন ছিল তিনটে। ওদের মধ্যে সবচে ছোটটার জন্ম দিতে গিয়ে ওদের মা স্বর্গে পাড়ি দিয়েছিল। বেঁচে রইলো বাপ যে ছিল দালাল। বাচ্চাগুলো ছোটছোট ছিল বলে, যেহেতু ওদের দেখাশোনার কেউ ছিল না, তাই তান্নার বাবা মহেশ্বর দালাল নিজের এই ইচ্ছেটা চাউর করলে যে কোনও বনেদি পরিবারের চাপে পড়া শান্ত সুশ্রী কনে পাওয়া যায় তো বাচ্চাদের লালন পালন হয়ে যায়, নইলে ওর কি বুড়ো বয়েসে মেয়েমানুষের শখ হয়েছে না কি? রাম রাম! এমন কথা চিন্তাও করা উচিত নয়। ওর তো কেবল বাচ্চাদের দুশ্চিন্তা নয়তো যে কদিন বেঁচে আছে তা ঠাকুর-দেবতার ভজন আর গঙ্গা স্নান করে কাটাতে হবে। আর তান্নার মা, তিনি তো দেবী ছিলেন, স্বর্গে আরোহন করলেন, মহেশ্বর ছিল পাপী তাই রয়ে গেলো। ছেলে মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই করা যায় না নয়তো হরিদ্বারে গিয়ে বাবা কালী কমলিওলার আশ্রমে দুবেলা দুমুঠো খেতো আর পরলোকের পথ ধরতো।

কিন্তু পাড়ার মাসি-পিসিরা কেউই এমন শান্ত সুশ্রী কনে যোগাড় করে দিতে পারলো না যে বাচ্চাগুলোর লালান-পালন করবে, তাই সবশেষে বাধ্য হয়ে মহেশ্বর দালাল এক মহিলাকে সেবা-টেবা করার জন্যে আর ছেলে মেয়েদের লালন-পালনের জন্যে নিয়ে এলো।

সে মহিলা এসেই সবচেয়ে প্রথমে মহেশ্বর দালালের আয়েশের পুরো ব্যবস্থা করলে। ওর পালঙ্ক, বিছানা, তামাক-গড়গড়া তারপর তিনটে মেয়ের চরিত্র আর শিষ্টাচার একেবারে কড়া চোখে যাচাই করলো আর তারপর তান্নার বাজে খরচ কমাবার চেষ্টা করলো পুরোপুরি। যাহোক ভেঙে যাওয়া সংসারটাকে সে বেশ যত্ন করে সামলে নিলে আগাগোড়া। এখন সে জন্যে যদি তান্না আর ওর তিনটে বোনের সামান্য কষ্ট হয় তো তার জন্যে কে কী করতে পারে?

তান্নার বড়ো বোন সংসারের কাজকর্ম, ধোয়াপোঁছা, রান্না-বান্না করতো ; মেজো বোন যার পায়ের হাড় ছোটবেলা থেকেই রোগগ্রস্ত ছিল, সে হয় কোণে বসে থাকতো নয়তো উঠোনে পাছা ঘষটে-ঘষটে গালমন্দ করতো ভাই বোনদের ; সবচে ছোট বোনটা পাঁচু বেনের দোকান থেকে তামাক, চিনি, হলুদ, কেরোসিন তেল আর বাজার থেকে আদা, লেবু, কাঁচালঙ্কা, আলু, মুলো ইত্যাদি আনতে ব্যস্ত থাকতো। তান্না সকালে উঠে সারা বাড়ি ধুতো জল দিয়ে, লাঠিতে ঝাঁটা বেঁধে সবকটা ঘরের ঝুল ঝাড়তো, তামাকের ছিলিম সাজাতো, ততোক্ষণে স্কুলে যাবার সময় হয়ে যেতো। কিন্তু অতো তাড়াতাড়ি কী করেই বা রান্না হবে, অতএব না খেয়েই যেতে হতো স্কুলে স্কুল থেকে ফিরে রাত্তিরের রান্নার জন্যে কাঠ কাটতে হতো, আগুন সেঁকার উনুন সাজাতে হতো, লণ্ঠন জ্বালাতে হতো, পিসির (মেয়েমানুষটাকে বাচ্চারা পিসিমা বলে ডাকুক হুকুম ছিল মহেশ্বর দালালের) গা টিপে দিতে হতো প্রায়ই কেননা বেচারি ক্লান্ত হয়ে যেতো কাজ করে-করে আর তারপর তান্না রোয়াকের সামনেকার বাতিস্তম্ভের মিটমিটে আলোয় স্কুলের পড়াশুনা করতো। বাড়িতে একটাই লণ্ঠন ছিল আর সেটা পিসির ঘরে জ্বলতো নিভতো।

তান্না ছিল দুর্বল প্রকৃতির। ফলে তান্না প্রায়ই মায়ের কথা মনে করে কাঁদতো। আর ওকে কাঁদতে দেখে বড়ো আর ছোট বোনও কাঁদতো আর মেজোটা দু পা থেবড়ে গালমন্দ আরম্ভ করতো ওদের আর পরের দিন পিসিকে কিংবা বাপকে চুগলি করতো আর পিসি কপালে আলতার টিপ পরতে-পরতে-বলতো, "এই অকম্মের ঢেঁকি গুলোর আমার খাওয়া-নাওয়া, ওঠা-বসা, পোশাক-আশাক ভালো লাগেনা। আদাজল খেয়ে পড়ে আছে পেছনে। কী-ই এমন কষ্ট আছে শুনি! বড়ো-বড়ো নবাবের ছেলেরাও এরকম ভাবে থাকে না যেমন ভাবে তান্না বাবু সেজেগুজে ফুলবাবুটি হয়ে, টেরিকেটে, নাগর হয়ে ঘুরে বেড়ায়।" আর তারপর মহেশ্বর দালালের পরিবারের মানসম্মান বজায় রাখার জন্যে বেদম পিটুনি দিতে হতো তান্নাকে, এমনকি তান্নার পিঠে কালশিটে পড়ে যেতো আর জ্বর এসে যেতো আর বোন দুটো ভয়ের চোটে যেতে পারতোনা ওর কাছে আর আনন্দে ডগমগ মেজো বোন পাছা-ঘষটে পাক খেতো উঠোনময় আর ছোট বোনকে বলতো, "অনেক পিটুনি পড়েছে। আরে এখন কি? ভগবান চাইলে একদিন ঠ্যাঙ ভাঙবে, মুখে গেরাস দেবার লোক জুটবে না। এবার আয়, আজ আমার চুলটা তো বেঁধে দে। আজ বেদম পিটুনি পড়েছে তান্নার।"

এই অবস্থায় যমুনার মা অনেক সাহায্য করেছিল তান্নার। ওদের ওখানে প্রায়ই পুজো-আচ্চা হতো আর তখন ওরা পাঁচটা বাঁদর আর পাঁচজন কুমারীকে খাওয়াতো। বাঁদরের মধ্যে তান্না আর কুমারীর মধ্যে তিন বোন নিমন্ত্রিত হতো আর যাবার সময় পিসি বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতো যে অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে রাক্ষসের

মতন গেলা উচিত নয়, আদ্দেক লুচি ছাঁদা বেঁধে আনা উচিত। তা-ই করতো ওরা সবাই আর যেহেতু লুচি খেলে শরীর খারাপ হয় তাই পিসি বেচারি লুচিগুলো নিজের জন্যে রেখে ছেলেমেয়েদের রুটি খাওয়াতো।

তান্নাকে যে কোনও অজুহাতে ডেকে নিতো যমুনা আর নিজের সামনে তান্নাকে বসিয়ে খাওয়াতো। তান্না খেতো আর কাঁদতো কেননা যদিও যমুনা ছিল ওর চেয়ে ছোটো কিন্তু কে জানে কেন ওকে দেখলেই নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে যেতো তান্নার আর তান্নাকে কাঁদতে দেখে যমুনার মনেও মমতা উপচে পড়তো আর যমুনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে ওর সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কইতো। হতে-হতে এমন হলো যে তান্নার যদি কেউ থাকে তো সে যমুনা আর যমুনার যদি চব্বিশঘণ্টা কারুর চিন্তা ছিল তো সে তান্নার। এখন এটাকেই তোমরা প্রেম বলো বা আর-কিছু!

কথাটা গোপন ছিল না যমুনার মায়ের কাছে, কারণ অমন বয়েসে হয়তো উনিও ছিলেন যমুনার মতন—আর যমুনাকে ডেকে অনেক বোঝালেন উনি আর বললেন যে এমনিতে তান্না ছেলেটা খুবই ভালো কিন্তু নিচু গোত্রের আর আমাদের বংশে আজ পর্যন্ত উঁচু গোত্রেই বিয়ে হয়েছে। কিন্তু যমুনা যখন অনেক কাঁদলো আর তিন দিন ওব্দি কিচ্ছু খেলো না তো ওর মা একটা মাঝামাঝি রফা করার কথা ভাবলেন মানে উনি বললেন যে তান্না যদি ঘরজামাই হতে রাজি হয় তো প্রস্তাবটা ভেবে দেখা যেতে পারে।

কিন্তু এর আগে যেমন বলা হয়েছে যে তান্না ছিল সৎ মানুষ আর ও রাখঢাক না রেখে বলে দিলে যে বাবা, যা-ই হোক না কেন, বাবা তো বটে। তার সেবা করা ওর কর্তব্য। ঘরজামাই হবার মতন কথা ভাবতেই পারে না কখনও। এ ব্যাপারে যমুনার বাড়িতে অনেক ঝড়ঝাপটা উঠলো কিন্তু শেষকালে যমুনার মায়েরই জয় হলো যে যখন যৌতুকের টাকা জমবে তখন বিয়ে দেবো, নয়তো মেয়ে কুমারী থাকবে। কোনও উপায় না থাকলে মেয়েকে অশথ গাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো কিন্তু নিচু গোত্রের বাড়িতে দেবেনা।

একথা যখন মহেশ্বর দালালের কানে পৌঁছালো তখন তার রক্ত ফুটে উঠলো টগবগ করে আর জানতে চাইলো—কোথায় তান্না? ম্যাচ দেখতে গেছে শুনে গলার স্বর সপ্তমে চড়ালো যাতে যমুনাদের বাড়িতে শুনতে পাওয়া যায়—"আসুক আজকে হারামজাদা। চামড়া না তুলে নিয়েছি তো আমার নাম নেই। কাঠের ঠুঁটিকে শাড়ি পরিয়ে নহবত বাজিয়ে আনবো তাই বলে ঐ সব লোকের বাড়ি আমি ছেলের বিয়ে দেবো যাদের...?" আর তারপর ওদের বাড়ির যে বাখান মহেশ্বর দালাল দিলে তা বাদ দাও। যাহোক তিন দিন ওব্দি খেতে দিলো না পিসি আর মহেশ্বর এমন ধোলাই দিলে যে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো আর

তৃতীয় দিন খিদেতে আঁকশি তান্না ছাদের ওপর গেলে যমুনার মা ওকে দেখতে পেয়েই দড়াম করে জানলা বন্ধ করে নিলে। আলসেতে শাড়ি শুকোচ্ছিল যমুনা, কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো ওর দিকে তারপর শাড়ি শুকোতে না দিয়েই চুপচাপ নিচে চলে গেলো। তান্না একটুক্ষণ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারপর নিচে নামলো চোখে জল নিয়ে আর বুঝে গেলো যে যমুনার ওপর ওর যা-কিছু অধিকার ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। আর যেমনটা বলা হয়েছে এর আগে যে ও সৎ লোক ছিল তাই আর ফিরেও তাকায়নি ওদিকে যদিও ওদিক পানে তাকালেই ওর চোখ জলে ভরে যেতো আর মনে হতো গলায় বুঝি আটকে আছে কিছু, বুকেতে ছুঁচ ফোটাচ্ছে কেউ। ক্রমশ পড়াশুনো থেকে তান্নার ইচ্ছে উবে গেলো আর প্রথম বছরের কলেজের পরীক্ষায় ফেল করে গেলো।

মহেশ্বর দালাল আরেকবার বেদম পেটালো ওকে, ওর মেজো বোনটা আহ্লাদে নিজের ন্যালবেলে ঠ্যাঙ দিয়ে মেঝে লাথাতে লাগলো, আর যদিও তান্না অনেক কাঁদলো আর মুখ বুজে এর বিরোধিতাও করলো, কিন্তু মহেশ্বর দালাল ওর পড়াশুনা ছাড়িয়ে ওকে আর এম এসের চাকরিতে ভর্তি করে দিলো আর ও চিঠিপত্রের ডাকের কাজ করতে লাগলো স্টেশানে। সে সময়ে মহেশ্বর দালালের চোখে একটা মেয়ে...

(এখানে আমি খোলশা করে দিই যে গল্পের বিষয়বস্তুর জন্যেই হোক, বা সেদিনকার সর্বগ্রাসী গুমোটের কারণে, কিন্তু সেদিন মাণিক মুল্লার গল্পের শৈলীতে আগেকার দুটো গল্পের মতন চটপটে ভাব ছিল না। অদ্ভুত ধরণের নীরস ঢঙে উনি বিবরণী দিয়ে যাচ্ছিলেন আর আমরাও কোনও রকমে মন লাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলাম। বেজায় গুমোট ছিল। গল্পেও, ঘরেও।)

যাকগে, তা সে সময়ে মহেশ্বর দালালের নজর একটা মেয়ের ওপর পড়লো যার বাপ মরে গিয়েছিল। মায়ের একমাত্র সন্তান। মায়ের বয়েস যা-ই হোক দেখে বলা বেশ কঠিন ছিল যে মা-বেটির মধ্যে কে উনিশ কে বিশ। একটা বাগড়া ছিল, মেয়েটা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বসছিল যদিও তান্নার চেয়ে বয়েসে ছিল ছোটো। কিন্তু সমস্যা হলো যে ঐ সুন্দরী বিধবার ছিল অগাধ সম্পত্তি। না ছিল কোনও দেওর, না ছিল ছেলে। অতএব তাকে সাহায্য আর রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তান্নাকে ইণ্টারমিডিয়েট পাস বলে তার মেয়ের সঙ্গে তান্নার বিয়ে পাকা করে ফেললো মহেশ্বর দালাল। কিন্তু তা এই শর্তে যে বিয়ে তখনই হবে যখন মহেশ্বর দালাল নিজের মেয়েগুলোর হিল্লে করে নেবে আর ততোদিন মেয়েটা পড়াশুনা করবে না।

যেহেতু কনের তরফের সারা যোগাড়-যন্তর করার দায় মহেশ্বর দালালের ওপরই বর্তেছিল তাই ওর ফিরতে রাত এগারোটা বারোটা বেজে যেতো আর

অনেক সময়ে সেখানেই থেকে যেতে হতো রাত্তিরে কেন না যুদ্ধ চলছিল আর ব্ল্যাক আউট থাকতো, কনের বাড়ি ওই পাড়াতেই অন্য এলাকায় ছিল যার দুদিকে গেট, যা ব্ল্যাক আউটে নটা বাজতেই বন্ধ হয়ে যেতো।

পিসি এর বিরোধিতা করে বসলো, আর ফল হলো এই যে মহেশ্বর দালাল চাঁছাছোলা বলে দিলো যে, বাড়িতে ওর থাকার দরুণ পাড়ার চারিদিকে পাঁচজন পাঁচ কথা কইছে। মহেশ্বর দালাল একজন সম্ভ্রান্ত লোক, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে ওকে আর এই ঢোল আর কতোদিন গলায় বেঁধে বেড়াবে। শেষকালে হলো এই যে পিসি যেমন হেসে খেলে এসেছিল ঠিক তেমনিই কাঁদতে-কাঁদতে নিজের পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে চলে গেলো আর পরে জানা গেলো যে বোনেদের বিয়ের জন্যে তান্নার মা যা গয়নাগাটি আর কাপড় রেখে গিয়েছিল, সব উধাও।

এর দরুণ তান্নার কাঁধে বিরাট বোঝা চাপলো। সে সময়ে মহেশ্বর দালালের অবস্থা ছিল অদ্ভুত। পাড়ায় জোর গুজব ছিল যে মহেশ্বর দালাল যা রোজগার করে সব দিয়ে আসে একটা সাবান উলি মেয়েকে। বাড়ির পুরো খরচাপাতি করতে হতো তান্নাকে, বিয়ের ব্যবস্থাপত্তর করতে হতো, দুপুরে এ. আর. পিতে কাজ করতে হতো, রাত্তিরে আর এম এস-এ আর পরিণাম হলো এই যে ওর চোখের কোল বসে গেলো, পিঠ ঝুঁকে পড়লো, গায়ের রঙ পুড়ে গেলো আর চোখের সামনে উড়তে লাগলো কালো-কালো ছোপ।

যেমন-তেমন করে বিয়ে হলো বোনেদের। যমুনা এসেছিল বিয়েতে কিন্তু তান্নার সঙ্গে কথা কয়নি। একটা দালানে দুজনের দেখা হতে বসে রইলো চুপচাপ। যমুনা নখ দিয়ে মাটি খুঁটলো, তান্না দাঁত খুঁটতে লাগলো কাঠি দিয়ে। তা যমুনাকে দেখতে-শুনতে ভালো হয়ে গিয়েছিল ইদানিং আর খোঁপা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল গুজরাটি ঢঙে, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে তান্না ছিল সৎ লোক। তান্না যখন মহিলাদের ফল-মূল দিচ্ছিল তখন আরও সাজগোজ করে এসেছিল যমুনা আর তান্নাকে একটা প্রশ্ন করেছিল, “বৌদি কি অনেক সুন্দর তান্না?” “হ্যাঁ!” তান্না সরল ভাবে বললে রুদ্ধ কণ্ঠে ও বলেছিল, “আমার চেয়েও!” তান্না কোনও উত্তর দেয়নি, থতমত খেয়ে বাইরে চলে গেলো আর সকালের জন্যে কাঠ কাটতে লাগলো।

তান্নার বিয়ের পর বৌদির সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললো যমুনা। সকাল-সন্ধে আসতো প্রতিদিন, তান্নার সঙ্গে কথা বলতো না। সারাদিন বসে থাকতো বৌদির কাছে। বৌদি অনেক লেখাপড়া শেখা, তান্নার চেয়েও বেশি আর একটু অহংকারী। তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ি চলে যেতে যমুনা একদিন এলো আর তান্নাকে এমন সমস্ত কথা বলতে লাগলো যা আগে বলেনি কখনও তো তান্না ওর পায়ে হাত রেখে বোঝালো যে যমুনা, তুমি কী ধরণের কথাবার্তা বলছো। তো যমুনা কাঁদলো বেশ কিছুক্ষণ তারপর চলে গেল ফোঁপাতে-ফোঁপাতে।

সেই সময় পাড়ায় এক অদ্ভূত ঘটনা ঘটলো। যে সাবানউলি মেয়েটার নাম মহেশ্বর দালালকে জড়িয়ে রটেছিল তাকে একদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তার লাশও গায়েব করে দেওয়া হলো আর পুলিশের ভয়ে বেয়ানের বাড়িতে গিয়ে থাকতে লাগলো মহেশ্বর দালাল।

তান্নার জীবন-যাপনও ছিল আজব। স্ত্রী বেশি লেখাপড়া শেখা, অনেক বড়োলোক ঘরের, অত্যন্ত রূপবতী, সবসময়েই ঠেশ দিয়ে কথা বলতো, মেজো বোন পাছা ঘষটে-ঘষটে গালমন্দ করতো, "দুটো পায়েই পোকা ধরুক রামের কৃপায়!" অফিসার ওকে কোনও কাজের নয় বলে ঘোষণা করেছিল আর এমন ডিউটি দিয়েছিল যাতে ফি হপ্তার চারদিন চার রাত ট্রেনে যাত্রা করতে হয় আর বাদবাকি দিনগুলো কাটে হেডকোয়ার্টারে বকুনি খেতে-খেতে। ওর নামের ফাইলে অনেক অভিযোগ জমা পড়েছিল। ঠিক সে সময়েই ওদের অফিসে ইউনিয়ান হলো আর সৎ হবার দরুণ ও আলাদা থাকলো তা থেকে, যার ফলে হলো এই যে অফিসারও রুষ্ট আর সহকর্মীরাও।

তার মাঝেই বিয়ে হয়ে গেল যমুনার, পটল তুললো মহেশ্বর দালাল, প্রথম বাচ্চাটা হবার সময়ে তান্নার স্ত্রী মরতে-মরতে বাঁচলো আর বেঁচে ওঠার পর সে তান্নাকে নোংরা টিকটিকির চেয়েও বেশি ঘৃণা করতে লাগলো। ছোটো বোনটা বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেলো আর তান্না শুধু এটুকুই করতে পারলো যে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেলো, রগের কাছে চুল পেকে গেলো, কুঁজো হয়ে হাঁটতে লাগলো, বুকের ব্যারাম দেখা দিলো, চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো আর পাঁচনশক্তি এমন কাহিল হয়ে গেলো যে একগাল খাবারও হজম হতো না।

ডাক নিয়ে যাবার সময়ে একবার ট্রেনে নিমসার যাবার পথে তীর্থযাত্রিনী যমুনার সঙ্গে দেখা। রামধন ছিল সঙ্গে, গভীর মমতায় পাশে এসে বসলো যমুনা, ওর ছেলেটা প্রণাম করলো মামাকে। দুজনকেই খাবার খেতে দিলে যমুনা। রুটি খেতে গিয়ে তান্নার চোখে কান্না এসে গেলো। যমুনা ওকে প্রস্তাবও দিলো যে, বিশাল বাড়ি আছে, ঘোড়ার গাড়ি আছে, খোলা হাওয়া আছে, এসে থাকো কিছু দিন, শরীরস্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু বেচারা তান্না! নৈতিকতা আর সততা অনেক বড়ো জিনিস।

কিন্তু ঐ যাত্রা থেকে তান্না যে ফিরলো একেবারে কাৎ হয়ে গেলো। কয়েক মাস পড়ে রইলো জ্বরে। রোগের ব্যাপারে ডাক্তারদের রায় ছিল পরস্পরবিরোধী। কেউ বললে হাড়ের ব্যারাম, কেউ বললে রক্তাল্পতা, তো কেউ আবার ক্ষয় রোগও বললে। বাড়ির এমন অবস্থা যে ট্যাঁকে একটা পয়সাও নেই, বৌ-এর গয়নাগাটি নিয়ে শাশুড়ি চলে গেল নিজের বাড়ি, ছোটো বোন কান্নাকাটি করে বেড়ায়, মেজো পাছা ঘষতে-ঘষতে বলে, "এখন কি, এখন তো পোকায় ধরবে!" কেবল ইউনিয়ানের লোকেরা এসে ভালো-ভালো পরামর্শ দিয়ে যেতো—খোলা হাওয়ায় রাখো, ফলের

রস খাওয়াও, বিছানা পালটে দেয়া উচিত প্রতিদিন, এছাড়া বেচারারা করবেটাই বা কি!

হতে-হতে এমন দুরবস্থায় পৌঁছোলো যে ওকে অফিস থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হলো, বাড়িতে উপোস আরম্ভ হলো তো শাশুড়ি এসে নিজের মেয়েকে নিয়ে গেলো আর বললো যে কোমরে যখন জোর ছিলই না তো সাতপাক দিয়ে ছিলেই বা কেন আর তার ওপর ইউনিয়ান-ফিউনিয়ানের গুণ্ডা-বজ্জাতরা এসে সারাদিন হই-হুল্লোড় করে। তাদের সামনে তান্নার বোনরা যাক, গান গাক, নাচুক, তাই বলে ওনার মেয়ে তো আর এই পেশা করতে পারে না।

এদিকে ইউনিয়ান লড়ছিল ওর চাকরির জন্যে আর যখন চাকরি ফিরে পেলো তখন সবাই উপদেশ দিলে যে, দুসপ্তাহের জন্যে অফিস যাতায়াত করুক, সবাই মিলে করে দেবে ওর কাজটা আর তারপর ফের ছুটি নিয়ে নিক।

ওর দেহটা হয়ে গিয়েছিল যেন হাড়-পাঁজরার কাঠামো। হাঁটার সময়ে কাছ থেকে পাঁজরার খড়খড়ানি ওব্দি শোনা যেতো। সাহসে ভর করে গেলো কোনওরকমে। অফিসাররা সব চটেই ছিল। মেল ট্রেনে রাত্তিরের ডিউটিতে লাগিয়ে দিলে আর তাও আবার দোলযাত্রার দিন। রঙে ভিজে থর-থর করে কাঁপতে-কাঁপতে পৌঁছোলো স্টেশানে। সারা শরীর চিড়বিড় করছিল। কাজকর্ম তো সহকর্মীরা সেরে দিলে, ও পড়ে রইলো চুপচাপ। ট্রেনের কামরাটা ছিল স্যাঁতসেতে। শরীর ভেঙে পড়ছিল, স্নায়ু হয়ে গিয়েছিল কাহিল। সকাল হলো। টুণ্ডলা পৌঁছোলো। একটু-আধটু রোদ উঠেছিল। ও দরোজার কাছটায় দাঁড়ালো গিয়ে। গাড়ি চলতে লাগলো। পা কাঁপছিল থরথর করে, আচমকা ইনজিনের জলের ট্যাঙ্কের ঝোলানো বালতি লাগলো ওর কানপাটিতে আর ও অজ্ঞান হয়ে গেলো।

চোখ মেলতে নিজেকে টুণ্ডলা হাসপাতালে পেলো। দুটো পা-ই ছিল না। কেউ-ই ছিলনা আশে-পাশে, প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। এতো রক্ত বেরিয়েছিল যে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছিল না চোখ দিয়ে। ভাবলো, কাউকে ডাকবে তো মুখ দিয়ে যমুনার নাম বেরোলো, তারপর নিজের ছেলের, তারপর বাবার (মহেশ্বর) আর তারপর চুপ হয়ে গেলো।

অনেকে জিজ্ঞেস করলো, "কাকে টেলিগ্রাম করি, কী করা দরকার?" কিন্তু কোনও উত্তর দিলো না ও। কেবল মারা যাবার আগে নিজের দুটো কাটা পা দেখার ইচ্ছে জাহির করলো আর ওগুলো নিয়ে এলে ঠিক মতন দেখতে পাচ্ছিল না, তাই বারবার ছুঁয়ে দেখছিল, টিপছিল, তোলার চেষ্টা করছিল, আর হাত সরিয়ে নিচ্ছিল আর কাঁপছিল থরথর করে।

কে জানে আমার কেমন যেন লাগলো আর আমি নিষ্কর্ষ শোনার অপেক্ষা না করে চুপচাপ উঠে চলে এলুম।

নিষিদ্ধ পাঠ

বেজায় গুমোট! মনের গভীর থেকে গভীরতম স্তরে এক অদ্ভুত উদ্বেগ। ঘুম আসছে আবার আসছেও না। নিমগাছের ডালগুলো নির্বাক। বিজলি বাতির আলোয় তার ছায়া বাড়িগুলোয়, টালির চালে, আলসের ওপর আর গলিতে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে সিঁটিয়ে।

আমার আধোঘুম মনের মধ্যে অসংলগ্ন স্বপ্ন-চিন্তা জায়মান।

স্বর্গের দরোজা। অনুমান করে নিন রূপ, রেখা, রঙ, আকার কিছুই যেন নেই। মনে করুন যেন অতিবাস্তববাদী কবিতা যার কোনও মানে হয় না। দরোজার বাইরে রামধন বসে আছে। ভেতরে শ্বেতবসনা যমুনা, শান্ত গম্ভীর। তার বিশৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষা, তার বৈধব্য, পদ্ম পাতার ওপর শিশিরবিন্দুর মতন ছড়িয়ে পড়েছে, ও ঠিক তেমনই রয়েছে যেমন তান্নার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হবার সময়ে ছিল।

দরোজার চৌকাঠে ঘোড়ার নাল ঠোকা। এক, দুই, অসংখ্য! দূরের আবছা দিগন্ত থেকে সরু ধোঁয়ার রেখার মতন একটা পথ এগিয়ে এসেছে। তার ওপর কী যেন দুটো জিনিস খোঁড়াচ্ছে। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে পথ, যেন তারের তৈরি সাঁকো।

মেঘের ভেতরে একটা টর্চ জ্বলে ওঠে। পথে এগিয়ে আসছে তান্না। আগে-আগে তান্না, কাটা পায়ে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে, পেছন-পেছন ওর কাটা পা দুটো এগিয়ে আসছে, নড়বড় করে। পা দুটোর ওপর আর এম এস-এর রেজিস্টার চাপানো।

দরোজার কাছে পৌঁছে পা দুটো থেমে যায়। দরোজা খুলে যায়। ফাইল-রেজিস্টার তুলে নিয়ে ভেতরে চলে যায় তান্না। বাইরেই থেকে যায় পা জোড়া। টিকটিকির কাটা ল্যাজের মতন কিলবিল করে।

কোনও শিশু কাঁদছে। সে তান্নার বাচ্চা। চাপা কণ্ঠস্বর ঃ ইউনিয়ান, এস এম আর, এম আর এস, আর এম এস, ইউনিয়ান। কাটা পা দুটো ফেরত যাওয়া আরম্ভ করে, ধোঁয়ার পথ তারের সাঁকোর মতন কাঁপে।

দূরে কোনও স্টেশান থেকে মেল ট্রেন ছাড়ে...

চতুর্থ দুপুর

মালবার যুবরানী দেবসেনার গল্প

তন্দ্রা আসার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ গুমোট ভেদ করে এলো এক ঝলক হাওয়া আর তারপর এতো জোরে বাতাস বইতে লাগলো যে নিমগাছের ডালপালা নেচে উঠলো। একটু পরে নক্ষত্রগুলোর ওপর একটা কালো পর্দা ছেয়ে গেলো। বাতাস সঙ্গে করে এনেছিল মেঘ। আমরা বেশ বেলা ওব্দি ঘুমোলুম কেননা বাতাস বইছিল আর রোদ ওঠার কোনও প্রশ্নই ছিল না।

কে জানে বেলা ওব্দি শোবার কারণে না মেঘের জন্যে, কেননা কালিদাস-ও বলেছেন—"রম্যাণি বীক্ষ মধুরাংশ্চ"—কিন্তু আমার মনমেজাজ বড্ডো বিষণ্ণ ছিল আর আমি শুয়ে-শুয়ে কোনও একটা বই পড়তে লাগলুম, বোধহয় 'স্কন্দগুপ্ত' যাতে শেষকালে নায়িকা দেবসেনা বেহাগ রাগে গান ধরে, 'হায় বেদনা পেয়েছি বিদায়' আর হাঁটু গেড়ে বিদায় ভিক্ষা করে—এই জীবনের দেবতা আর ঐ জনমের প্রাপ্য ক্ষমা! আর তারপর অনন্ত বিরহ জুড়ে যবনিকা পতন।

ওটা পড়ে আরও বিষণ্ণ হয়ে গেলো আমার মন আর আমি ভাবলুম বরং চলো মাণিক মুল্লার কাছেই যাক। আমি পৌঁছে দেখলুম যে মাণিক মুল্লা চুপচাপ বসে জানলার পথে মেঘ দেখছেন আর পা দুটো চেয়ারে ঝুলিয়ে আস্তে-আস্তে নাড়াচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলুম যে মাণিক মুল্লার মনে অনেক পুরোনো কোনও কষ্ট মাথা চাড়া দিয়েছে কারণ এই উপসর্গটা ঐ রোগেরই। এরকম অবস্থায় দুটো প্রতিক্রিয়া হয় মাণিকের মতন লোকেদের। কেউ যদি ওনার সঙ্গে ভাবপ্রবণ কথাবার্তা বলে তো তক্ষুনি তা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যখন সে চুপ হয়ে যাবে তখন একটু-একটু করে নিজেই ঐ প্রসঙ্গের সূত্রপাত করবেন। মাণিক-ও সেটাই করলেন। আমি যখন বললুম যে আমার মন বড়োই বিষণ্ণ তো উনি হাসলেন আর যখন আমি বললুম যে কাল রাত্তিরের স্বপ্ন আমার মনকে বেশ প্রভাবিত করেছে তো উনি আরও হাসলেন আর বললেন, "ঐ স্বপ্ন থেকে দুটো ব্যাপার টের পাওয়া যায়।"

"কী?" জিজ্ঞেস করলুম আমি।

"প্রথম তো এই যে তোমার হজম শক্তি ঠিক নেই, দ্বিতীয় এই যে তুমি দান্তের ডিভাইন কমেডি পড়েছো যাতে নায়কের নায়িকার সঙ্গে স্বর্গে দেখা হয় আর তাকে নিয়ে যায় ঈশ্বরের সিংহাসন পর্যন্ত।" যখন আমি বিনয়ে স্বীকার করলুম

যে দুটো কথাই একেবারে ঠিক তো উনি তাতে চুপ করে গেলেন, আগের মতনই জানলার পথে মেঘের দিকে তাকিয়ে পা দোলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, "জানি না তোমাদের কেমন লাগে, মেঘ দেখলে আমার তো সেরকম মনে হয় যেমন সেই বাড়িটা যেখানে হেসে-খেলে শৈশব কাটিয়েছি আর তা ছেড়ে কতো জায়গায় কাটিয়েছি আর তারপর ঘটনাচক্রে বহু বছর পর ভুলক্রমে এসে দাঁড়িয়েছি ঐ বাড়িটার সামনে"। যখন আমি স্বীকার করলুম যে আমার মনে এরকম ভাবনাই উদয় হয় তো আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন, "দেখো, জীবনে যদি ফুল না থাকতো, মেঘ না থাকতো, পবিত্রতা না থাকতো, আলো না থাকতো, কেবল অন্ধকার থাকতো, পাঁক থাকতো, নোংরামি থাকতো তো কতো ভালো হতো! আমরা সবাই তাতে পোকার মতন কিলবিল করতুম আর মরে যেতুম, কখনও অন্তরাত্মায় কোনও রকম ছটপটানি থাকতো না। কিন্তু বড়োই ভাগ্যহীন হয় আমাদের সেসব দিন যেদিন আমাদের আত্মা পবিত্রতার চিলতে ঔজ্জ্বল্য দেখতে পায়, আলোকরশ্মির একটা কণা পেয়ে যায় কেননা তারপর হাজার বছর অন্ধকারে কারারুদ্ধ থাকলেও আলোর পিপাসা তাতে মেটে না, তাকে ব্যাকুল করে রাখে। অন্ধকারের সঙ্গে সে বোঝাপড়া করে নিক কিন্তু কখনও সে শান্তি পায় না।" আমি ওনার বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত ছিলুম কিন্তু একটু-আধটু লেখালিখি করলেও, সে সময়ে এতো ভালো হিন্দি বলা আমার রপ্ত হয়নি তাই ওনার বিষণ্ণতার সঙ্গে মনের মিল প্রকাশ করার জন্যে আমি চুপচাপ গোমড়া মুখে বসে রইলুম। ঠিক ওনার মতনই গোমড়া মুখে মেঘের দিকে তাকিয়ে রইলুম আর পা দোলাতে লাগলুম। মাণিক মুল্লা বলতে থাকলেন,—"এখন এই প্রেমের কথাই ধরো। একথা সত্যি যে প্রেম আর্থিক অবস্থার দ্বারা অনুশাসিত হয়, কিন্তু আমি যে উৎসাহের বশে বলেছিলুম যে প্রেম হলো আর্থিক নির্ভরতার আরেক নাম, তা কেবল আংশিক সত্য। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে ভালোবাসা—" এখানে মাণিক মুল্লা থেমে গেলেন আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক্ষমা কোরো, তোমার অনুশীলিত শৈলীতে যদি বলি তাহলে এ ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে ভালোবাসা আত্মার অতলে ঘুমন্ত সৌন্দর্যের সঙ্গীতকে জাগায়, আমাদের অন্তরে অদ্ভুত এক পবিত্রতা, নৈতিক নিষ্ঠা আর জ্যোতি ভরে দেয়, ইত্যাদি। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"কিন্তু আমরা সবাই ঐতিহ্যে, সামাজিক পরিস্থিতি, মিথ্যে বাঁধনে এমনভাবে জড়িয়ে আছি যে সামাজিক স্তর তাকে গ্রহণ করতে পারে না, নড়তে পারে না তার জন্যে আর ওপরে নিজের কাপুরুষতা আর দীনতার ওপর সোনার জল চড়িয়ে তাকে ঔজ্জ্বল্য দেবার চেষ্টা করে যায়। এই রোমান্টিক প্রেমের গুরুত্ব আছে বটে, কিন্তু গোলমাল হলো যে তা কচি মনের ভালোবাসা, তাতে স্বপ্ন,

রামধনু আর ফুল তো পর্যাপ্ত পরিমানে থাকে কিন্তু সেই সৎসাহস আর পরিপক্কতা থাকে না যা এই সমস্ত স্বপ্ন আর ফুলগুলোকে সুস্থ সামাজিক সম্পর্কে পালটে দিতে পারে। তার ফলে কিছু কালের মধ্যেই এগুলো সেভাবেই মন থেকে উবে যায় যেমন মেঘের ছায়া। আসলে আমরা তো আর হাওয়ায় বাস করি না আর যে ভাবনাচিন্তা আমাদের সামাজিক জীবনের উর্বরক হতে পারে না, জীবন তাকে আগাছার মতন উপড়ে ফেলে দেয়।

ততোক্ষণে ওঙ্কার, শ্যাম আর প্রকাশ-ও এসে পড়েছিল। আর আমরা সবাই মনে-মনে অপেক্ষা করছিলুম যে কখন মাণিক মুল্লা নিজের গল্প আরম্ভ করবেন, কিন্তু ওনার উড়ো-উড়ো মনস্থিতির দরুণ আমাদের সাহসে কুলোচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে মাণিক মুল্লা নিজেই আমাদের মনের কথা টের পেয়ে গেলেন আর হঠাৎ নিজের দিবাস্বপ্নের জগত থেকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, "আজ আমি তোমাদের এমন একটি মেয়ের গল্প শোনাবো, এমন বাদলা দিনে যাকে আমার বারবার মনে পড়ে। বিস্ময়কর ছিল মেয়েটি।"

এরপর মাণিক মুল্লা যখন গল্প আরম্ভ করলেন তখন আমি বাধা দিলুম আর মনে করিয়ে দিলুম যে ওনার গল্পে সময়ের বিস্তার এতো সীমাহীন যে ঘটনা পরম্পরা অতি দ্রুত এগোচ্ছে আর বিবরণ এতো তাড়াতাড়ি দিচ্ছেন যে ব্যক্তিগত মনোবিশ্লেষণ আর মনস্থিতি নিরূপণ করার প্রতি ঠিক মতন নজর দিতে পারা গেলো না। আগের গল্পটার এই দুর্বলতা স্বীকার করলেন মাণিক মুল্লা, কিন্তু মনে হলো ভেতরে-ভেতরে ঘা খেলেন কেননা উনি রেগেমেগে বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, "আচ্ছা নাও, আজকের গল্পের ঘটনাকাল মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সীমিত থাকবে—চ৯ জুলাই, সন ১৯... এর সন্ধ্যা ছটা থেকে ৩০ জুলাই সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত," আর তারপর উনি গল্প আরম্ভ করলেন ঃ (গল্প বলার আগে আমাকে বললেন, "শৈলীতে তোমার আদল এসে গেলে ক্ষমা কোরো।"

জানলায় টাঙানো বাতাসের চেয়েও হালকা জর্জেটের পর্দাকে চুমো খেয়ে বিকেলের সূর্যের বিষণ্ণ হলুদ রশ্মি সেই মেয়েটিকে উঁকি মেরে দেখলো, যে বালিশে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাচ্ছিল। ওর শুকনো চুলের গোছা লবণাক্ত কান্নায় ধোয়া গাল স্পর্শ করে হয়ে উঠছিল শিহরিত। চাঁপা ফুলের কুঁড়ির মতন ওর লম্বা অপলকা শিল্পীত আঙুল, ফোঁপানিতে কেঁপে-কেঁপে ওঠা ওর যুঁইফুল তনু, গোলাপের শুকনো পাপড়ির মতন ওর ঠোঁট, আর ঘরের বিষণ্ণ বাতাবরণ ; কে জানে কোন যাতনা ছিল যার বিষণ্ণ আঙুলগুলো থেকে-থেকে ওর ব্যক্তিত্বের মৃণালতন্তু সঙ্গীতকে ঝাঁকিয়ে তুলছিল।

কিছুক্ষণ পর ও উঠে পড়লো। ওর চোখের কোলে ছিল একটা হালকা কালো ছায়া যেটা ফুলে উঠেছিল। রাজহাঁসের মতন ছিল ওর চলন, কিন্তু এমন এক

রাজহাঁস যে কে জানে কতো দিনের জন্যে বিদায় নিচ্ছে মানস সরোবর থেকে। ও গভীর শ্বাস নিলো আর মনে হলো যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে জাফরানি তন্তুজাল। ও উঠে জানলার কাছে গিয়ে বসলো। বাতাসে ভাসমান জর্জেটের পর্দা কখনও উড়ে এসে লাগছিল কানের কাছে, কখনও ঠোঁটের কাছে, কখনওবা...সেকথা থাকুক!

বাইরে সূর্যের শেষ রশ্মি সোনালি বিষণ্ণতা ছড়াচ্ছিল নিম আর অশত্থের মগডালে। দিগন্তের কাছে জড়ো হয়েছিল জামরঙা একটা গভীর ছায়া-পরত, যার ওপর গোলাপ ছড়ানো আর তার ওপারে কাঁপছিল ফিকে হলুদ ঝড়ের আত্মা।

"খুকি ঝড় উঠবে। খেয়ে নেবে চলো!" দরোজায় দাঁড়িয়ে মা বললো। মেয়ে কিছু বললো না মুখে, কেবল মাথা নাড়ালো। মা কথা কইলো না, ইশারাও করলো না। মায়ের একমাত্র মেয়ে, সারা বাড়িতে শুধু মা আর মেয়ে একা, মেয়ে মনে করলে মেয়ে, ছেলে মনে করলে ছেলে! মেয়ের কথা অমান্য করার সাহস ছিল না কারুর। মা দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর চলে গেলো। মেয়ে উদাসীন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো ছেঁড়াছেঁড়া জামরঙা মেঘ আর তাকে ঘিরে গোলাপের অগ্নিকাণ্ড আর তার দিকে ধাবমান ঝড়কে।

অস্পষ্ট কাজলের ওড়নি গায়ে চাপিয়ে নিলো সন্ধ্যা। ও সেখানেই বসে রইলো নির্বাক, বেলে মাটির শিল্প-প্রতিমার মতন, দৃষ্টিতে থেকে থেকে নারগিস-ফুল, বিষণ্ণ আর নম্র নারগিস-ফুল নেচে উঠছিল।

"বলুন মশায়!" মাণিক প্রবেশ করতে ও উঠলো আর লাইট জ্বালালো কোনও কথা না বলে। ওর খিন্ন মনস্থিতি, ওর অশ্রুসিক্ত মৌনতা দেখে থেমে গেলেন মাণিক মুল্লা আর গম্ভীর স্বরে বললেন, "কী হলো? লিলি! লিলি!"

"কিছু না!" হাসার চেষ্টা করে বললো মেয়েটি, কিন্তু চোখ ছলছল করে উঠলো আর ও বসে পড়লো মাণিক মুল্লার পায়ের কাছে।

ওর মাকড়িতে জড়ানো এক গোছা শুকনো চুলের পাক ছাড়াতে ছাড়াতে মাণিক বললো, "বলবে না তাহলে?"

"আমি কখনও কোনও কথা তোমার কাছে লুকিয়েছি!"

"না, এখনও পর্যন্ত তো লুকোওনি, আজ থেকে লুকোচ্ছো!"

"না, কোনও ব্যাপার নেই, বিশ্বাস করো!" মেয়েটি, যার নাম ছিল লীলা আর যাকে ডাকা হতো লিলি নামে, মাণিকের শার্টের ঝিনুকের বোতাম খুলে আর বন্ধ করে বললো।

"ঠিক আছে বোলো না! আমিও আর কিচ্ছু বলবো না তোমায়।" মাণিক উঠে পড়ার চেষ্টা করে বললো।

"যাচ্ছো কোথায়—" মাণিকের কাঁধের ওপর ও হেলে পড়লো—"বলছি তো।"

"বলো তাহলে!"

লিলি সামান্য কুণ্ঠিত আর তারপর ও মাণিকের হাত নিজের ফোলা চোখের পাতার ওপর রেখে বললো, "হয়েছে এই যে আজকে দেবদাস দেখতে গিয়েছিলুম। কামিনীও ছিল সঙ্গে। যাহোক, ওর তো মাথায় ঢোকেনি। আমার কে জানে কেন কেমন যেন লাগলো। মাণিক, কী হবে, বলো? এখন তো তুমি যদি একদিন না আসো তাহলে না খেতে ভালো লাগে, না পড়তে। এবার তো মাসের পর মাস তোমায় দেখতে পাবো না। সত্যি, এমনিতে হাসি, কথা বলি, কিন্তু যেই একথাটা মনে পড়ে অমনি যেন শিলাবৃষ্টি আঘাত করে।"

মাণিক বললেন না কিছু। এক সকরুণ যাতনা ছেয়ে গেলো ওনার চোখে আর বসে রইলেন চুপচাপ। ঝড় এসে গিয়েছিল আর টেবিলের তলা থেকে উড়ে সিনেমার দুটো আধটুকরো টিকিট একজোড়া প্রজাপতির মতন ঘরের দেয়ালে এদিকে-ওদিকে ধাক্কা খাচ্ছিল।

মাণিকের পায়ের ওপর টপ করে এক ফোঁটা গরম কান্নার জল পড়লে উনি চমকে উঠে দেখলেন লিলির চোখ ভরে আছে কান্নায়। হাত ধরে উনি লিলিকে কাছে টেনে নিলেন আর পাশে বসিয়ে, পায়রার মতন ছোটছোট ওর দুই পায়ে আঙুল দিয়ে ডোরা কাটতে কাটতে বললেন, "ছিঃ! এরকম কান্নাকাটি আমাদের লিলির শোভা পায় না। এগুলো দুর্বলতা, মনের মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি তো জানো আমার মনে কখনও তোমার জন্যে মোহ ছিল না, তোমার মনে কখনও আমার ওপর অধিকারের ভাবনা ছিল না। আমরা দুজনে জীবনে যদি একে আরেকের কাছে এসে থাকি তো তা এই জন্যে যে আমাদের অপূর্ণ আত্মা পরস্পরকে পূর্ণতা দিক, একে আরেকজনকে শক্তি দিক, আলো দিক, প্রেরণা দিক। আর পৃথিবীর কোনও ক্ষমতা কখনও আমাদের থেকে এই পবিত্রতাকে কেড়ে নিতে পারবে না। আমি জানি যে সারা জীবনে যেখানেই থাকি না কেন, যে অবস্থাতেই থাকি, তোমার ভালোবাসা আমায় শক্তি যোগাবে অথচ তোমার চিত্তে এরকম অস্থিরতা উদয় হচ্ছে কেন? এর মানে কে জানে আমার মধ্যে কিসের অভাব রয়েছে যার দরুণ তোমায় সেই বিশ্বাস যোগাতে পারছি না!"

চোখের জলে ঢাকা চাউনি মেলে লিলি ভয়ে-ভয়ে মাণিকের দিকে তাকালো যার মানে হলো—"অমন করে বোলো না, আমার জীবনে, আমার ব্যক্তিত্বে যা-কিছু তা তো তোমারই দেয়া।" কিন্তু শব্দের মাধ্যমে লিলি বলেনি একথা, চাউনি দিয়ে বললো।

মাণিক আলতোভাবে ওরই আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মুছলেন। বললেন, "যাও, চোখমুখ ধুয়ে এসো! চলো!" চোখমুখ ধুয়ে এলো লিলি। মাণিক বসে-বসে রেডিওর কাঁটা এমন ঘোরাচ্ছিলেন যে কখনও ঝম করে বেজে উঠছিল দিল্লি,

কখনওবা শোনা যাচ্ছিল লখনউ-এর দু-একটা অস্ফুট সঙ্গীতের ঢেউ, কখনও নাগপুর, কখনও বা কলকাতা (সৌভাগ্যবশত সেসময়ে এলাহাবাদে রেডিও স্টেশান ছিল না!)। লিলি বসে রইলো চুপচাপ, তার পর উঠে রেডিও বন্ধ করে দিলো আর আকুল আগ্রহে বলে উঠলো, "মাণিক, কথা বলো! মন বড়োই উদ্বিগ্ন।"

মাণিক হাসলেন আর বললেন, "আচ্ছা এসো কথা কই, কিন্তু আমার লিলি যতো ভালো ভাবে কথা কইতে পারে, তেমন আমি থোড়াই পারি। কিন্তু তাহোক! তো তোমার কামিনীর বুদ্ধিতে কুলোয়নি ফিল্মটা!"

"উঁহু!"

"কামিনী বড্ডো মাথা মোটা, কিন্তু সব সময় সব কাজে নাক গলাবার চেষ্টা করে।"

"তোমার যমুনার থেকে তো ভালো!"

যমুনার উল্লেখে হাসি পেয়ে গেলো মাণিকের আর বেশ আগ্রহে, আদর গলায় আর বেশ আচ্ছন্ন ভাবে লিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, "লিলি, তুমি স্কন্দগুপ্ত পড়ে ফেলেছো!"

"হ্যাঁ।"

"কেমন লাগলো!"

মাথা নাড়িয়ে লিলি জানালো অনেক ভালো লেগেছে। মাণিক আলতো ভাবে লিলির হাত টেনে নিলেন নিজের হাতে আর তার রেখার ওপর নিজের কম্পমান হাত রেখে বললেন, "আমি চাই আমার লিলি ঠিক সেরকমই পবিত্র, সেরকমই সূক্ষ্ম, সেরকমই দৃঢ় হোক যেমন ছিল দেবসেনা। তো লিলি কি হবে না তেমনটি!"

কোনও মহামানবিক, দেবতাদের সঙ্গীতে মুগ্ধ, অবুঝ হরিণের মতন ক্ষণিকের জন্যে মাণিকের দিকে তাকালো লিলি আর ওনার হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিলো। বাইরের জামরঙা মেঘ ছড়িয়ে দিলো এক পশলা বৃষ্টি আর ভিজে সোঁদা বাতাসের একটা ঝাপটা আলুথালু করে দিয়ে গেলো লিলির নৃত্যপরায়না চুলের গোছা।

"বাহ! ওদিকে দেখো লিলি!" লিলির মুখ পদ্মফুলের মতন দুহাতে তুলে মাণিক বললেন। বাইরে গলির বিজলিবাতি কে জানে কেন জ্বলছিল না, কিন্তু থেকে-থেকে চমকে উঠছিল নীলাভ বিদ্যুৎ আর দীর্ঘ সরু গলি, দুদিকের পাকা ইঁটের বাড়ি, তার ফাঁকা রোয়াক, বন্ধ জানলা, জনশূন্য বারান্দা, উদাসীন ছাদ, ঐ নীলাভ বিদ্যুতে যেন কেমন জাদুটোনা, রহস্যময় মনে হচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমকাতেই অন্ধকারকে চিরে তা দেখা দিচ্ছিল জানলায়, আর সহসা বিলীন হয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে আর সেইটুকু মুহূর্তে দেওয়ালগুলোয় ছটফট করে ওঠা বিদ্যুচ্চমকের রোশনাই ছড়িয়ে পড়ছিল, আলসের কিনারা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল জলের ধারা, কেঁপে-কেঁপে উঠছিল

বাতিস্তম্ভ আর ইলেকট্রিকের তার আর বাতাসে দোল খাচ্ছিল জলফোঁটার ঝালর। সমস্ত বাতাবরণ যেন কেঁপে উঠছিল বিদ্যুতের মিহি আঘাতে, নড়ে উঠছিল।

বেশ জোরে বাতাসের একটা ঝাপটা এলো আর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লিলি ভিজে গেলো জলের ফোয়ারায়, আর ভুরু থেকে, মাথা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পুঁছতে-পুঁছতে সরে এলে মাণিক বললেন, "ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো লিলি, জানলার কাছে, হ্যাঁ ঠিক অমন করেই। বৃষ্টি-ফোঁটা পুঁছো না। আর লিলি, এক গোছা চুল তোমার ভিজে ঝুলে আছে, কতো ভালো লাগছে!"

লিলি কখনও নির্বাক লজ্জায় জানলার বাইরে, কখনও বা লজ্জায় ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা মাণিকের দিকে তাকিয়ে ভিজতে লাগলো বৃষ্টির ঝাপটায়। যখনই চমকে উঠছিল বিদ্যুৎ তো মনে হচ্ছিল যেন আলোর ঝরণায় কাঁপছে নীল পদ্ম। প্রথমে কপাল ভিজে গেলো—লিলি জিজ্ঞেস করলো, "সরে যাই!" মাণিক বললো, "না!" মাথা থেকে জল গড়িয়ে এসেছে গলায়, ওর কণ্ঠলগ্ন সোনার মটর মালায় চুমু দিয়ে বৃষ্টি-ফোঁটারা নামছিল নিচে, ও কেঁপে উঠলো। "ঠাণ্ডা লাগছে?" জিজ্ঞেস করলো মাণিক। আত্মসমর্পণের এক অদ্ভুত বেপরোয়া কণ্ঠস্বরে লিলি বললো, "না, ঠাণ্ডা লাগছে না! কিন্তু তুমি একেবারে পাগল!"

"নই বটে, অনেক সময়ে হয়ে যাই! লিলি, ইংরিজিতে একটা কবিতা আছে— 'আ লিলি গার্ল নট মেড ফর দিস ওয়র্লডস পেইন!' ফুলের মতন মেয়ে যে এই পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টের জন্যে নয়। লিলি তোমাকে কি ঐ কবি জানতেন? 'লিলি'—তোমার নামটাও লিখে দিয়েছেন।"

"হুঁ! আমাকে তো নিশ্চই জানতো। তোমার মাথাতেও রোজ একটা নতুন ভাবনা উদয় হয়।"

"না। দেখো উনি এ-ও লিখেছেন—'অ্যাণ্ড লভিং আইজ হাফ ওয়েল্ড উইথ স্লামবারাস টিয়ার্স, লাইক ব্লুয়েস্ট ওয়াটার্স সোন থ্রু মিস্টস, অব রেইন'—তন্দ্রালু কান্নায় অর্ধপ্লাবিত আকুল চোখ, যেন কুয়াশায় ঢাকা নীলাভ জলরাশি..."

আচমকা দুরে বজ্রপতন হলো কোথাও আর লিলি চমকে-উঠে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাণিকের কাছে বেহুঁশ। বজ্র পতনের হৃদয় কাঁপানো আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো মুহূর্ত দুয়েক আর ভীত-চকিত চড়াই পাখির মতন লিলি দাঁড়িয়ে রইলো মাণিকের বাহুর ঘেরাটোপে। তারপর ও চোখ খুললো আর হাঁটু গেড়ে মাণিকের পায়ে ছোঁয়ালো দুটি গরম ঠোঁট। মাণিকের চোখে জল এসে গেলো। বাইরে ফিকে হয়ে এসেছিল বৃষ্টি। কেবল আলসে থেকে, টালির ছাদ থেকে টিপটিপ করে পড়ছিল জলের ফোঁটা। হালকা মেঘের দল উড়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে।

সকালে ঘুম ভাঙলো লিলির—কিন্তু না, ঘুম ভাঙেনি—সারারাত লিলির ঘুমই আসেনি। খাবার জন্যে কখন যে মা জাগিয়েছিল তা ওর খেয়াল নেই, কখন আর

কে ওকে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়, কখন ও বারণ করেছিল—ওর কেবল এটুকু মনে আছে যে সারারাত ও কে জানে কার পায়ে মাথা রেখে কেঁদেছিল। বালিশ ভিজে গিয়েছিল, চোখ ফুলে উঠেছিল।

কামিনী সাত সকালেই হাজির। আজকে লিলিকে আশীর্বাদের কথা, সন্ধ্যা সাতটায় বরপক্ষের লোকজন আসবে, শাশুড়ি তো নেই, শশুর আসার কথা আর কামিনী, যে লিলির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, যার ওপর ঘর সাজাবার আর লিলিকে সাজাবার ভার অথচ লিলি তখন কামিনীর কাঁধে মাথা রেখে এমন কাঁদছে যে তা বলার নয়!

কামিনী বেশ বাস্তববাদী বড়োই সংবেদনহীন মেয়ে। কত্তো বান্ধবীর বিয়ে দেখেছে ও। কিন্তু লিলির মতন আকারণে এমন বিলাপ করে কাঁদতে দেখেনি কাউকে। শশুর বাড়ি যাবার বেলায় কাঁদলে বোঝা যায়, নইলে দুচারজন বুড়োবুড়ি বলবে দেখো! আজকালকার মেয়ে লজ্জাশরম গুলে খেয়েছে। কেমন উটের মতন গলা উঁচু করে শশুরবাড়ি যাচ্ছে। আরে আমরা ছিলুম কাঁদতে-কাঁদতে সকাল হয়ে যেতো আর যখন হাতপা ধরে দাদা ঢুকিয়ে দিতো পাল্কির মধ্যে তখন বসতুম। আর এই এক এরা।

কিন্তু এরকম কেঁদে কী লাভ আর তাও এমন সময়ে যখন মা বা অন্য কেউ কাছে নেই। সামনে কাঁদলে না হয় বোঝা যায়! যাহোক কামিনী চটাচটি করতে থাকলো আর লিলির কান্না থামছিল না।

নিজের কাজ তাড়াতাড়িই সেরে ফেললো কামিনী কিন্তু বাড়িতে ও বলে এসেছিল যে আজ সারাদিন এখানেই থাকবে। কামিনী হলো কাজকম্মের পাড়াবেড়ানি মেয়ে। ওর খেয়াল হলো এলনগঞ্জে যাবার ছিল, সেখানে থেকে সেলাই-ফোঁড়াই-এর বই আনতে হবে, ফলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। লিলির মায়ের অনুমতি নিয়ে, তাড়াহুড়োয় লিলিকে জোর করে শাড়িটাড়ি পরিয়ে, বেরিয়ে পড়লো দুই বন্ধু মিলে।

মেঘলা করেছিল আর বেশ প্রীতিদায়ক ছিল আবহাওয়া। এখানে-সেখানে জল জমেছিল রাস্তায়, যাতে স্নান করছিল পাখিরা। এলনগঞ্জে নিজের কাজ সেরে হেঁটে বেড়াতে বেরোলো দুজনে। একটু দুরেই বাঁধ, যার তলা দিয়ে গেছে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা পুরোনো রেলের লাইন। লাইনের মাঝ বরাবর ঘাস গজিয়েছে আর বৃষ্টির পর ঘাসের ডগায় জ্বলজ্বল করছিল লাল হীরের মতন। সেখানেই বসে পড়লো দুই বন্ধু—একটা লাল পোকা মরচে পড়া লোহার লাইন পেরোবার চেষ্টা করছিল থেকে-থেকে আর পিছলে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। কিছুক্ষণ ধরে সেটাকে দেখলো লিলি আর তারপর বিষণ্ণ হয়ে কামিনীকে বললো, "কামিনী! আর ঐ খাঁচা থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না, কোথায় থাকবে এই ঘোরাফেরা, কোথায়

তুমি।" কামিনী, যে একটা ঘাসের ডগা চিবোচ্ছিল, রেগেমেগে বললো, "দেখ লিল্লি! আমার কাছে এসব কান্নাকাটি করে লাভ নেই। বুঝলি! আমার এসব আদিখ্যেতা একদম ভাল্লাগে না। পৃথিবীতে সব মেয়েই তো জন্মাবার পর বিয়ে করে, তুই-ই একটা আলাদা জন্মেছিস নাকি? আর বিয়ের আগে সবাই অমন কথা বলে, তারপর বিয়ের পর তো ভুলেই যাবি কোথাকার কে কামিনী!"

লিলি বললো না কিছু, কেবল দাঁত-বের-করা হাসি হাসলো। আরেকটু হাঁটলো দুই বন্ধুতে। লাল পোকা তুলে তুলে জড়ো করছিল লিলি। হঠাৎ একটা ঝোপের কাছে পড়ে থাকা সাপের খোলশ দেখালো কামিনী, আর তারপর দুজনে পৌঁছোলো একটা বড়ো পেয়ারা-বাগানে আর বর্ষাকালের দুতিনটে পেয়ারা পেড়ে খেলো যেগুলো বেশ ডাঁশা ছিল, আর শেষকালে একটা পুরোনো গোরস্থান আর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পৌঁছোলো বিরাট একট পুকুরের কাছে যেখানে ধোপাদের পাথর পাতা ছিল। খোলশ, লাল পোকা, পেয়ারা আর শ্যামলিমা এক অদ্ভুত সুখানুভূতি উৎপন্ন করলো লিলির মনে আর কেঁদে-কেঁদে ক্লান্ত ওর মন পাশ ফিরলো উল্লাসে। চটি খুলে খালি পায়ে পায়চারি করতে লাগলো ঘাসের ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই লিলি এক অন্য লিলিতে রূপান্তরিত, যেন হাসির ঢেউয়ের ওপর ঝিকমিকে রোদ্দুর, আর সন্ধে পাঁচটা নাগাদ যখন ওরা বাড়ি ফিরলো তখন ওদের হাসাহাসির চোটে ধড়মড় করে উঠলো পাড়া আর লিলির তখন জোরে খিদে পেয়েছে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি করে এমন জোরে খিদে পেয়েছিল লিলির যে ফিরেই মায়ের কাছে খেতে চাইলো আর যখন নিজেই তাকের ওপর থেকে পাড়ছিল তখন মা বললে যে নিজে সব খেয়ে ফেলবি তো শ্বশুর কী খাবে তাইতে ও হেসে বললো, "আরে যেটুকু বাঁচবে আমি ওনাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেবো। আগে তো চেখে নিই, নইলে পরে বদনাম হবে!" তক্ষুনি খবর পাওয়া গেলো যে ওনারা এসে পড়েছেন। খাবার আধ-খাওয়া ফেলে রেখে চট করে ভেতরে গেলো লিলি। কামিনী শাড়ি পরিয়ে দিলে ওকে, সাজগোজ করালো কিন্তু এতো জোরে ওর খিদে পেয়ে গিয়েছিল যে ওনাদের সামনে যাবার আগে ফের বসে বসে খেতে লাগলো, এমনকি কামিনী জোর করে ওর সামনে থেকে সরিয়ে নিলো থালা, আর টেনে নিয়ে গেলো।

সারাদিন খোলামেলা হাওয়ায় ঘোরাঘুরি করে আর পেট ভরে খাওয়ার ফলে সকালে লিলির চেহারায় যে বিষণ্ণতা ছিল তা কেটে গিয়েছিল একেবারে, কনেকে খুবই পছন্দ হলো ওনাদের। আগের দিন সন্ধ্যায় ওর জীবনে যে ঝঞ্ঝাবর্ত উঠেছিল তা শান্ত হয়ে গেল পরের দিন।

এতোটা বর্ণনার পর মাণিক মুল্লা বললেন, "প্রিয় বন্ধুগণ! দেখলে তোমরা!

খোলামেলা হাওয়ায় বেড়ালে আর সূর্যাস্তের আগে খেয়ে নিলে সমস্ত রকম শারীরিক আর মানসিক ব্যাধির উপশম হয় অতএব কী নিষ্কর্ষ বেরোলো এ থেকে?"

"খাও, গতর বানাও!" ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে সমস্বরে বলে উঠলুম সবাই।

'কিন্তু মাণিক মুল্লা!" জিজ্ঞেস করলো ওঙ্কার, "একথা আপনি বললেন না যে মেয়েটিকে কী ভাবে জানতেন, কেনইবা জানতেন, কে-ই বা ছিল এই মেয়েটি?"

"আচ্ছা! আপনারা চান যে গল্পের ঘটনাকাল চব্বিশ ঘণ্টায় আবদ্ধ রাখি তারমধ্যে আপনাদের পুরো মহাভারত আর এনসাইক্লোপিডিয়া শোনাই! আমি কেমন করে জানতুম তাতে আপনার কী? হ্যাঁ, একথা আপনাদের জানিয়ে দিই যে যার সঙ্গে তান্নার বিয়ে হয়েছিল সেই মেয়েটিই লীলা আর সেদিন সন্ধ্যায় ওকে দেখার জন্যে মহেশ্বর দালালের আসার কথা ছিল!"

পঞ্চম দুপুর

কালো বাঁটের ছুরি

পরের দিন দুপুরে আমরা সবাই যখন জড়ো হলুম তখন আমাদের মনের অবস্থা ছিল অদ্ভুত। অমন রঙিন রোমান্টিক প্রেম থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারছিলুম না, আবার উল্টে এ ব্যাপারে হাসিও পাচ্ছিল, আর তৃতীয়ত মনের বিদঘুটে গ্লানিও ছিল যে আমরা সবাই, আর আমাদের সকলের এই কিশোরাবস্থার স্বপ্ন কতো শাঁসহীন হয় আর এই সমস্ত চিন্তাভাবনার টানাপোড়েন আমাদের মধ্যে কেমন যেন এক লজ্জাবোধ আর বিরক্তি— তাকে বরং খারাপ মেজাজ বলা ভালো হবে—অমন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে। অথচ মাণিক মুল্লা একেবারে নির্দ্বিঙ্গ ভাবে প্রসন্নচিত্তে আমাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথাবার্তা বলছিলেন আর আলমারি-টেবিলের ধুলো ঝাড়ছিলেন যা জমেছিল রাত্তিরের ঝড়ের দরুণ, আর এমন লাগছিল যেমন মানুষ নিজের পুরোনো মোজা ফেলে দেয় আস্তাকুঁড়ে ঠিক তেমনিই নিজের সেই রোমাণ্টিক ভ্রমকে মমতাহীন হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন আর সেদিকে একবারটি ফিরে দেখারও ইচ্ছে রাখেননি।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলুম, "এই ঘটনাতো গভীর প্রভাব ফেলে থাকবে আপনার মনে?"

আমার এই প্রশ্নে ওনার মুখে দুটো-চারটে মিহিন করুণ রেখার উদ্রেক হলো, কিন্তু বেশ চালাকি করে নিজের মনের অবস্থা লুকিয়ে উনি বললেন, "মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন যে যতো ছোটই হোক আর যতো বড়োই হোক, কোনও ঘটনা এমন হয় না যা মানুষের মনের ভেতরে গভীর প্রভাব ফেলে না।"

"অন্তত আমার জীবনে যদি এমনটা হতো তাহলে তো সারা জীবন একেবারে মরুভূমি হয়ে যেতো। পৃথিবীর কোনও জিনিস আমার মনে কোনও আগ্রহ সঞ্চার করতে পারতো না।" আমি বললুম।

মাণিক মুল্লা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন আর বললেন, "তার মানে তুমি এখনও জীবনের পরিচয় পাওনি আর ভালো উপন্যাসও পড়োনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছে, আর এরকমই শোনা গেছে বৎস, যে, এই ধরনের নিষ্ফল উপাসনার পর জীবনে এমন কোনও নারী আসে যে বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং আর্থিক দৃষ্টিতে নিচুস্তরের হলেও তার ভেতরে অধিকতর সততা, অধিকতর চারিত্র্য, অধিকতর আনুগত্য আর অধিকতর ইচ্ছাশক্তি থাকে। উদাহরণের জন্যে শরৎ

চ্যাটার্জির দেবদাস মুখার্জির কথাই ধরো। পার্বতীর পর তিনি চন্দ্রমুখী পেলেন। এই রকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। মাণিক মুল্লাকে তুমি ছোট মনে করছো না কি? লিলির ঘটনার পর মাণিক মুল্লা গান্ধারীর মতন সারা জীবন চোখে কাপড় বেঁধে রাখার প্রতিজ্ঞা করে নিলো। কিন্তু কাপড় বেঁধে নিলেই ভালো হতো কেননা লিলির পর সতীর প্রতি আকর্ষণ না আমার পক্ষে শুভ হলো, না ওর পক্ষে। কিন্তু ও ছিল একেবারে ভিন্ন ধাতুর, যমুনার থেকে আলাদা আর লিলির থেকেও আলাদা। বেশ বিচিত্র ওর গল্পটাও..."

"কিন্তু মুল্লা ভাই! একটা কথা আমি বলবো, যদি তুমি খারাপ না মনে করো তাহলে—" মাঝপথে বাধা দিয়ে বললো প্রকাশ, "এই গল্পগুলো যেগুলো তুমি বলছো তা একেবারে সাদা-সাপটা বিবরণের মতন। তাতে কিছু কথাশিল্প, কিছু কাটছাঁট, কিছু টেকনিকও তো থাকা দরকার।"

"টেকনিক! হ্যাঁ টেকনিকের ওপর তারাই জোর দেয় যারা কোনও একটা ব্যাপারে অপরিপক্ক, যে অনুশীলন করছে, যে উচিত মাধ্যম খুঁজে পায়নি। তবুও টেকনিক সম্পর্কে চিন্তা করা সুস্থ প্রবৃত্তির লক্ষণ যদি না তা অনুপাতের থেকে বেশি হয়। আমার প্রশ্ন যদি ওঠে, গল্প বলবার দৃষ্টিকোণ থেকে আমার তো ফ্লবেয়ার আর মপাসাঁ অনেক ভালো লাগে কেন না তাঁদের মধ্যে পাঠককে নিজের জাদুতে বেঁধে ফেলার ক্ষমতা আছে, যদিও তাঁদের পর গল্পের ক্ষেত্রে চেখভ ছিলেন একজন বিচিত্র ব্যক্তি আর আমি ওনার সামনে সাষ্টাঙ্গ হই। চেখভ একবার কোনও মহিলাকে বলেছিলেন, "গল্প বলা কঠিন ব্যাপার নয়। আমার সামনে আপনি যে কোনও জিনিস রাখুন, এই কাঁচের গেলাসটা, এই অ্যাসট্রে আর বলুন এগুলোকে নিয়ে গল্প বলতে। একটু পরেই জেগে উঠবে আমার কল্পনা আর এদের সঙ্গে জড়িত কতো মানুষের জীবন মনে পড়বে আর জিনিসটা একটা সুন্দর বিষয় হয়ে উঠবে গল্পের।"

এই অবসরের সুযোগ নিয়ে আমি তাকের ওপর থেকে কালো বাঁটের ছুরিটা তাড়াতাড়ি তুলে এনে রেখে দিলুম সবায়ের মাঝে আর বললুম, "আচ্ছা এটাকে সতীর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু করুন দিকিনি।'

"করুন দিকিনি!" মাণিক মুল্লা গম্ভীর ভাবে বললেন, "এটাই তো ওর গল্পের কেন্দ্রবিন্দু! যখনই এই ছুরিটাকে দেখি কল্পনায় ভেসে ওঠে এর কালো বাঁট ধরে সুন্দর ফুলের পাপড়ির মতন গোলাপি নখের লম্বা আঙুল আবেশে কাঁপছে, এমন মুখশ্রী যে আবেশে আরক্ত, সামান্য নিরাশায় নীলাভ আর কিছুটা ভয়ে বিবর্ণ! এটাই আমার স্মৃতিচিত্র যখন শেষবার সতীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আর আমি চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতেও পারিনি। এই ছুরিটাই ছিল ওর হাতে।"

তারপর উনি সতীর যে গল্প বললেন, তার টেকনিক অনুসরণ না করে আমি সংক্ষেপে বলছি ঃ

মাণিক মুল্লার মতে মেয়েটিকে ভালো বলা যায় না, কেননা ওর চালচলনে এক বিদঘুটে বিলাসিতা প্রতিফলিত হতো, হাঁটাচলার ঢঙ উদ্দীপ্ত করার মতন, ও পথচলতি যে কারুর, পরিচিত অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে উদগ্রীব থাকতো, হাঁটতে হাঁটতে গলিতে গুনগুন করতো আর লোকের দিকে তাকিয়ে অকারণে হাসতো।

কিন্তু মাণিক মুল্লার বক্তব্য অনুযায়ী মেয়েটাকে খারাপও বলা যায় না কেননা ওকে নিয়ে কোনও গুজব ছিল না সেরকম আর সকলেই ভালো করে জানতো যে কেউ যদি আজেবাজে দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় তো তার চোখ উপড়ে নেবে। ওর কোমরে সব সময় একটা কালো বাঁটের ছুরি থাকতো।

সবাই বলতো যে ওর কাকা, যার সঙ্গে ও থাকতো, সম্পর্কে ওর কেউ ছিল না, লোকটা আসলে ফতেপুরের কাছাকাছি কোনও গ্রামের নাপিত যে সেনায় ভর্তি হয়ে কোয়েটা বেলুচিস্তানে গিয়েছিল আর সেখানের কোনও গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলে তিন-চার বছরের এই কাঁদতে-থাকা মেয়েটাকে পেয়েছিল যাকে ও তুলে এনেছিল আর তারপর মানুষ করতে লাগলো। মেয়েটা অনেক দিন পর্যন্ত ওদিকেই ছিল, আর তারপর লোকটার একটা হাত কেটে যেতে পেনশান পেয়ে গেলো আর এখানেই থাকতে লাগলো এসে। একটা হাত কেটে যাওয়ায় বাপঠাকুর্দার পেশার কাজ করতে পারতো না, কিন্তু এখানে এসে সাবানের ব্যবসা চালু করে দিলে আর চমন প্রামাণিকের চাকা ছাপ সাবান শুধু পাড়াতেই নয়, এমনকি বড়োবাজারের দোকানগুলোয় ওব্দি বিক্রি হতো। যেহেতু ওর একটা হাত কাটা ছিল, তাই ষোল-সতেরো বছরের অপরূপ সুন্দরী সতী সাবানের লেই জমাতো, সেই কালো বাঁটের ছুরি দিয়ে তার টুকরো কাটতো, দোকানদারদের কাছে নিয়ে যেতো আর পনেরো দিন অন্তর গিয়ে দাম নিয়ে আসতো। প্রতিটি দোকানদার ওর মাথায় বাঁধা রঙ-বেরঙ রুমাল, ওর বেলুচি জামা, চওড়া ঘেরের ঘাঘরার দিকে চুপিচুপি তাকাতো আর অন্যসব সাবানের বদলে চাকা ছাপ সাবান রাখতো দোকানে, ক্রেতাদের অনুরোধ করতো এই সাবানের জন্যে আর তারা চেষ্টা করতো পনেরো দিনের শেষে যাতে সতীকে বেশি থেকে বেশি টাকা দেয়া যায়।

কারখানার বাইরে খাট পেতে চমন প্রামাণিক নারকেল-খোলের হুঁকো টানতো আর সতী কাজ করতো ভেতরে। শ্রমের ফলে সতীর গতরের এমন গঠন, মুখ্যশ্রীতে এমন তেজ, কথাবার্তায় এমন আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছিল যে মাণিক মুল্লা যখন ওকে দেখলেন, ওঁর মনে লিলির অভাব প্রশমিত হলো অনেকটা আর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন সতীর ব্যক্তিত্বে।

অদ্ভুত ভাবে সতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ওনার। কারখানার বাইরে বসে গঙ্গা বানিয়ার কাছে দেনাপাওনার হিসেব করছিল চমন আর সতী মিলে। যা-কিছু পড়াশুনা চমন করেছিল যেসব ভুলে মেরে দিয়েছিল, সতী করেছিল একটু-আধটু লেখাপড়া কিন্তু এই হিসেবটা ছিল বেশ জটিল। অন্য দিক দিয়ে মাণিক মুল্লা দই কিনে বাড়ি ফিরছিলেন তো দেখতে পেলেন হিসেব নিয়ে দুজনের তর্কাতর্কি। সতী মাথা নাড়াতেই ঝিকমিকিয়ে উঠছিল ওর কানের দুল দুটো আর যেই হাসছিল ফুটে উঠছিল ওর মুক্তোর মতন দাঁত, ঘুরে দাঁড়াতে ডগমগ করে উঠছিল কাঞ্চনবর্ণ দেহ আর মাথা নামাচ্ছিল তো দোল খাচ্ছিল সাপের মতন বেণী। এখন মাণিক মুল্লার পদক্ষেপ যদি মাটিতে আটকে যায় তো তাতে মাণিক মুল্লার দোষটা কী?

ইতিমধ্যে চমন প্রামাণিক বলে উঠলো, "নমস্কার নেবেন দাদা!" আর ওর কাটা ডান হাতটা আড়মোড়া ভেঙে ঝুলে পড়লো। সতী একগাল হেসে বললে, "নাও হিসেবটা একটু মিলিয়ে দাও তো বাবু!" আর মাণিক বৌদির জন্যে দই নিয়ে যাবার কথা ভুলে গিয়ে এতোক্ষণ যাবত হিসেব মেলাতে লাগলো যে কড়া বকুনি দিলে বৌদি। কিন্তু তারপর থেকে প্রায়ই সতীর হিসেব মেলাবার দায় এসে পড়লো ওনার কাঁধে আর গণিতে আচমকা ওনার আগ্রহ বৃদ্ধি ছিল অবাক হবার মতন ব্যাপার।

কে জানে কেন মাণিক মুল্লাকে নিজের বন্ধুবান্ধবের অন্তর্ভুক্ত করে নিলে সতী। পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় এমন এক বন্ধু। এমন এক বন্ধু যাকে সাবান তৈরির সব উপাদান বলে দেয়া যায়। যার সম্পর্কে আশ্বাস ছিল যে সাবানের উপাদানের কথা অন্য সাবান কোম্পানিদের জানাবে না। হিসেবের ব্যাপারটা যার হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া যায়, যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় যে হারাধন স্টোর্সকে ধারে মাল দেয়া উচিত হবে কি না। মাণিক আসতেই সব কাজ ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াতো সতী, সতরঞ্চি বেছাতো, জমানো সাবানের ডালা নিয়ে আসতো আর কোমর থেকে কালো ছুরিটা বের করে সাবানের টুকরো কাটতো আর মাণিককে বলতো সারা দিনকার সুখদুঃখের গল্প। জোচ্চুরি করেছে কোন বেনে, কে সবচে বেশি সাবান বেচেছে, কোথায় নতুন মনোহারি দোকান খুলেছে, এইসব।

ওর পাসে বসে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি টের পেতেন মাণিক মুল্লা। খাটাখাটুনি-করিয়ে এই স্বাধীন মেয়েটির ব্যক্তিত্বে এমন-কিছু ছিল যা লেখাপড়া শেখা বুদ্ধিমতী লিলিতে ছিল না, আর অবদমিত মনের অশিক্ষিতা যমুনার ছিল না। সরল সুস্থ মমতাবোধ ছিল ওর যে চাইতো সহমর্মিতা আর বিলোতো সহমর্মিতা। যার কাছে বন্ধুত্বের মানে ছিল একে অপরের সুখদুঃখ, শ্রম আর উল্লাসের ভাগাভাগি। ওর অন্তরে কোথাও থেকে কোনও রকমের প্যাঁচ, কোনও জটিলতা কোনও ভয়, কোনও

অবদমন, কোনও দুর্বলতা ছিল না, কোনও বন্ধন ছিল না। অঢেল রোদ্দুরের মতন স্বচ্ছ ছিল মন। সোনায় সোহাগা হতো যদি ও লিলির মতন অন্তত সামান্য শিক্ষা পেতো। তবুও যেটুকু ওর মধ্যে ছিল তা মাণিক মুল্লাকে নীলিম স্বপ্নে ভেসে বেড়াবার যেমন প্রেরণা দিতো না, তেমনই টেনে নামাতো না বিকৃতির অন্ধকার খাদে। পৃথিবীর মাটিতে স্বাভাবিক মানবীয় জীবনবোধে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিতো। এমন সমস্ত চেতনা ও জাগিয়ে তুলতো যা জাগাতে সক্ষম এমনতরই কোনও সঙ্গিনী যে স্বাধীন, যে সাহসী, যে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের কাঁচের আড়ালে সাজানো পুতুলের মতন প্রাণহীন আর অন্তঃসারশূন্য নয়। যে উৎপাদন আর শ্রমের সামাজিক জীবনে কাম্য অংশ গ্রহণ করে, নিজের উচিত দায় মেটায়।

আমার বক্তব্য এই নয় যে মাণিক মুল্লা ওর পাশে বসে এই সমস্ত ভাবনাচিন্তা করতেন। না, এগুলো তো সেই পরিস্থিতির আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ। এমনিতে মাণিক মুল্লার ওকে খুব ভালো লাগতো আর সে সময়ে পড়াশুনায় মন বসতো মাণিক মুল্লার, কাজকর্ম করতে, আর ওজনও বেড়ে গেলো, খিদেতেষ্টাও পেতে লাগলো বেশ, উনি কলেজের খেলাধূলোয় অংশ নেয়া আরম্ভ করলেন।

সামান্য চটেমটে মাণিক মুল্লা স্বীকার করলেন যে ওঁর মনে সতীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল আর প্রায়ই সতীর হাতির দাঁতের মতন গ্রীবায় চুমো দেবার সময় তার কানের দুলের দোল খাওয়া দেখে ওনার ঠোঁট কেঁপে উঠতো, আর মাথার ধমনীতে বেগে ধাবিত হতো গরম রক্ত। অমন গভীর বন্ধুতা সত্ত্বেও সতীর আচরণে যমুনার মতন কোনও ব্যাপার নজরে পড়েনি। মাণিকের দৃষ্টি তখনই সতীর কোমরে গোঁজা ছুরিটার দিকে নজর পড়লে ফের ঠাণ্ডা হয়ে যেতো মাথা, কেননা সতী ওনাকে বলেছিল যে একবার একজন দোকানদার সাবান রাখতে-রাখতে বলেছিল, "সাবান তো কোন ছার আমি তো সাবানউলিকেই রেখে নেবো দোকানে," তো সতী তক্ষুনি ছুরি বের করে বলেছিল, "আমাকে তোর দোকানে রাখ আর এই ছুরিটা নিজের বুকেতে রাখ হারামজাদা!" তাইতে ব্যাপারিটা সতীর পা ছুঁয়ে দিব্যি খেয়ে বলেছিল যে ওতো আসলে ঠাট্টা করছিল, নইলে ওতো নিজের গিন্নিকেই ধরে রাখতে পারেনি। সে-ই চলে গেছে দারোয়ানের সঙ্গে তো সতীকে আর রাখবে কোত্থেকে।

সেই ঘটনার কথা খেয়াল রেখে মাণিক মুল্লা বলতেন না কিছু, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ছেয়ে গিয়েছিল এক অব্যক্ত সকরুণ বিষণ্ণতা ওনার আত্মাকে ঘিরে আর সে সময়ে উনি গুটিকয় কবিতা লেখাও আরম্ভ করেছিলেন যেগুলো হতো বড়ো বেশি বিরহের করুণ গান যাতে কল্পনা করতেন যে সতী বহুদূরে চলে গেছে ওনার কাছ থেকে আর তারপর উনি তাতে সতীকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, হে প্রিয়তমা তোমার প্রণয়ের স্বপ্ন প্রতিপালিত হচ্ছে আমার হৃদয়ে আর আজীবন লালিত

হবে। অনেক সময়ে বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে লিখতেন যার সারমর্ম ছিল মেঘের ছায়াতলে আর আমি তৃষিত থাকতে পারি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোদ্দা কথা হলো যে যা-কিছু উনি সতী বলতে পারতেন না সেগুলোই বেঁধে ফেলতেন গানে আর যদিবা কখনও সতীর সামনে সেসব গুনগুন করার চেষ্টা করতেন হেসে কুটিকুটি হয়ে যেতো সতী আর বলতো, তুমি বিয়ের গান শুনেছো? সাঁঝবেলার গান শুনেছো? আর তারপর পাড়ায় যেসব গান গাওয়া হয় সেগুলো এমন দরদ দিয়ে গাইতো যে ভাববিভোর হয়ে উঠতেন মানিক মুল্লা আর নিজের গানকে মনে হতো শব্দের আড়ম্বর এবং কৃত্রিম। এরকমই ছিল সতী, সবসময় কাছে, সবসময় দূরে, নিজেতে নিজে এক স্বতন্ত্র সত্তা, যার সঙ্গ মাণিক মুল্লার মনে তৃপ্তি এনে দিতো আর আকুলতাও।

অনেক সময়ে উনি ভেবেছেন যে চিঠিতে লিখে ফেলবেন নিজের মনের কথা আর কখনও-কখনও যথেষ্ট দীর্ঘ এবং সুমধুর চিঠি লিখেও ফেলতেন, এমনকি সেগুলো যদি রাখা থাকতো তাহলে নেপোলিয়ান আর সিজারের প্রেমপত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতো, কিন্তু যখন তাতে "আত্মার জ্যোতি", "চাঁদের রাজকুমারী" ইত্যাদি লিখে ফেলতেন তখন ওনার হুঁশ হতো যে এ-ভাষা তো বেচারি সতী বুঝতে পারবে না, আর যে-ভাষা ওর বোধগম্য তা ব্যবহার করলে ওর কোমরে ঝোলা ছুরির ছবি জেগে উঠতো মস্তিষ্কে। সে সব চিঠি তাই ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন উনি।

তারই মাঝে মাণিকের প্রতি সতীর মমতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল আর যখনই মাণিক মুল্লা সে-পথ দিয়ে যেতেন, বাড়ির বাইরে বসে-থাকা চমন প্রামাণিক ওনাকে সেলাম ঠুকতো কাটা হাত নেড়ে, হাসতো আর উনি পেছন ফিরলেই তাকাতো কটমট করে দাঁত খিঁচিয়ে আর ঠ্যাং ঝাঁকিয়ে হুঁকোর আগুন ওসকাতো। মাণিকের খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, দিনযাপন সমস্ত ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করতো সতী আর পরে পাড়া-প্রতিবেশিদের বলতো যে মাণিক এখন বারো ক্লাসে পড়ছে আর এরপর লাট সায়েবের দফতরে চাকরি পেয়ে যাবে আর সবসময় মাণিককে মনে করিয়ে দিতো যে পড়াশোনায় ঢিলেমি দিও না।

কিন্তু একটা ব্যাপার প্রায়ই নজরে পড়তো মাণিকের যে আজকাল সতী কেমন মনমরা থাকে আর এমন কোনও কথা আছে যা মাণিকের কাছ থেকে লুকোচ্ছে। মাণিক অনেক জিজ্ঞেস করেছিল কিন্তু ও বললে না। কিন্তু ও প্রায়ই চমন প্রামাণিককে মুখঝামটা দিতো, পথের মাঝে ছিলিম পড়ে থাকলে লাথিয়ে দিতো, নিজে হিসেবপত্তর না মিলিয়ে খাতা আর উসুলির টাকা ছুঁড়ে ফেলতো ওর সামনে। একদিন চমন প্রামাণিক মাণিককে বললে যে একে যদি আমি না এনে লালন-পালন করতুম তাহলে চিল আর শকুনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতো আর একথাই মাণিক যখন সতীকে জানালো তখন ও বললে, "এই রাক্ষসটা ছিঁড়েখুঁড়ে খাবার বদলে

চিল আর শকুনে খেয়ে ফেললেই ছিল ভালো!" আশঙ্কিত হয়ে মাণিক জানতে চাইলে ও বেশ বিরক্ত হয়ে বললে, "এ আমার কাকা সাজে। সেজন্যেই খাইয়ে-দাইয়ে বড়ো করেছে। এর নজরে গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমি ভয় পাই না। এই ছুরিটা সদাসর্বদা থাকে আমার কাছে।" সেই প্রথমবার উনি সতীকে কাঁদতে দেখলেন আর অনাথ, পরিশ্রমী, আশ্রয়হীন মেয়েটা অঝোরে কাঁদলো আর কয়েকটা ঘটনার কথা জানালো ওনাকে। সেকথা শুনে নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না মাণিক মুল্লার, কিন্তু বেশ ব্যথিত হলেন উনি আর এমনও হতে পারে জানতে পেরে ওনার মনে প্রগাঢ় আঘাত লেগেছিল। সেদিন রাত্তিরে ওনার খাবার রুচলো না আর জীবন এরকম বিকৃত আর নোংরা জেনে ওনার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

তারপর উনি দেখলেন সতী আর চমন প্রামাণিকের মাঝে বেড়েই চলেছে কটুতা, সাবান থেকে রোজগার ঝিমিয়ে পড়তে লাগলো আর মাণিক প্রায়ই গিয়ে ক্রন্দনরতা সতীকে দেখতে পেতেন আর চমন প্রামাণিককে দেখতেন চেল্লাচ্ছে-গরজাচ্ছে। ও ছিল অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য তাই বলতো—গুলি মেরে দেবো তোকে। দু টুকরো করে ফেলবো সঙিন খুঁচিয়ে। তুই ভেবেছিস কী? ইত্যাদি।

সতীর মুখে সেদিন একটু আনন্দ দেখা গেল যেদিন ও জানতে পারলো যে মাণিক বারো ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মাসে প্রথমবার ও চমন প্রামাণিকের কাছে দুটো টাকা চাইলে, এক টাকার মিষ্টি আনালো আর আরেক টাকার পুজো দিয়ে এলো চণ্ডীতলায়। কিন্তু সেদিন মাণিক আসেইনি। যেদিন মাণিক এলো সেদিন ওর শুনে মনখারাপ হয়ে গেল যে মাণিক চাকরি করতে চায় না, বরং পড়াশুনা করতে চায়, যদিও দাদা-বৌদি বারণ করে দিয়েছে যে দিনকাল খারাপ যাচ্ছে আর ওনারা মাণিকের খরচ যোগাতে পারবেন না। দাদা-বৌদির সঙ্গে একমত ছিল সতী; কেননা ও নিজের চোখে বড়োলাটের দফতরে দেখতে চাইছিল মাণিককে, কিন্তু যখন ও দেখলো যে মাণিকের ইচ্ছে পড়াশুনার দিকে তখন বললো, "মনখারাপ কোরো না। যদি আমি এখানে থাকি তাহলে আমি দেবো তোমায় টাকা। যদি না থাকি তো দেখা যাবে।"

উদ্বিগ্নকণ্ঠে মাণিক মুল্লা জানতে চাইলেন, "কোথায় যাবে তুমি?" তো সতী আরেকটা কথা বললো যা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মাণিক মুল্লা।

মহেশ্বর দালাল, মানে তান্নার বাবা, আসতো প্রায়ই আর যেহেতু দালাল হবার কারণে স্যাকরা আর জুহুরিদের সঙ্গে ওর ভালো জানাশোনা ছিল তাই গিল্টির বালা আর পায়েল পালিশ করিয়ে আর রূপোর গয়নায় নকল সোনার জল চড়িয়ে আনতো আর চেষ্টা করতো সতীকে দেবার। মাণিক যখন জিজ্ঞেস করলে যে চমন প্রামাণিক বাধা দেয় না তখন ও বললো যে রোজগারের তো আগেই বারোটা

বেজে গেছে, চমন টেনে গাঁজা আর মদ খাচ্ছে। মহেশ্বর দালাল প্রতিদিনই নতুন নোট এনে দিচ্ছে ওকে। রোজ নিয়ে যাচ্ছে নিজের সঙ্গে। রাত্তিরে মদ খেয়ে ফেরে আর এমন কথাবার্তা বলে যে নিজের ঘরের দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ করে নেয় সতী আর ভয়ে সারারাত ওর ঘুম আসে না। এইটুকু বলে ও কেঁদে ফেললো আর বললো, মাণিক ছাড়া ওর আর কেউ নেই আর মাণিকও ওকে পথ দেখাচ্ছে না কোনও।

খুবই মন খারাপ হয়ে গেলো মাণিকের সেদিন আর একটা অতি বিষাদময় কবিতা লিখলেন আর সেটা ছাপাবার জন্যে স্থানীয় পত্রিকায় দিতে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় সতীর সঙ্গে দেখা। বেশ উৎকণ্ঠিত, কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলে গিয়েছে ওর। মাণিককে থামিয়ে ও বললো, "আমার এখানে আর এসো না তুমি। চমন প্রামাণিক তোমাকে খুন করার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা বুঁদ থাকে নেশায়। তুমি চিন্তা কোরো না। আমার কাছে ছুরি থাকে আর তারপর দরকার পড়লে তুমি তো আছোই। জানো, ওই বুড়ো ফোকলা মহেশ্বরটা বিয়ে করতে চাইছে আমায়!"

বড়োই বিপন্ন হয়ে পড়লো মাণিকের মন। বার কয়েক সতীর কাছে যাবার ইচ্ছে হলো কিন্তু সত্যি বলতে কি নেশাখোর চমনের কোনও ঠিক নেই, একটাই মোটে হাত বটে কিন্তু সেপাইয়ের হাত তো।

ইতিমধ্যে আরেকটা ব্যাপার হলো। এই পুরো কেচ্ছাটা নুন-মশলা মিশিয়ে ছড়িয়ে পড়লো মাণিক মুল্লার নামে আর পাড়ার গুটিকয় বুড়ি কড়াইশুঁটি ছাড়াবার অছিলায় এসে মাণিকের বৌদিকে আগাগোড়া কাহিনী বাখান করে গেলো আর তাগাদা দিলে যে শিগগির ওর বিয়ে দিয়ে দাও, কেউ-কেউ তো নিজের জাতির সুন্দর শান্তস্বভাব মেয়েরও হদিশ দিলে। নিজের দিক থেকে আরেকটু বাড়িয়ে কেচ্ছাটা দাদাকে বললে বৌদি আর পরের দিন মাণিককে ডেকে দাদা বললে যে মাণিকের ওপর ওর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু মাণিক এখন আর খোকা নেই, ওর উচিত জগতের দিকে তাকিয়ে চলা-ফেরা করা। এসব ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। এরা সব যথেষ্ট নোংরা আর বজ্জাত হয়। মাণিকের বংশের কতো মর্যাদা। দাদার স্নেহে অনেক কাঁদলেন মাণিক আর কথা দিলেন যে আর এই ধরণের লোকজনের সঙ্গে মিশবেন না।

সতী দুতিন বার এলো কিন্তু মাণিক মুল্লা বেরোলেন না বাড়ির বাইরে আর খবর পাঠিয়ে দিলেন যে বাড়িতে নেই। মাণিক প্রায়ই যমুনার কাছে যেতেন আর একদিন যমুনার বাড়ির দরোজায় সতীর সঙ্গে দেখা। মাণিক কোনও কথা না বলায় সতী কাঁদতে-কাঁদতে বললে, "ভাগ্য খারাপ বলে তুমিও সঙ্গ ছেড়ে দিলে। কী দোষ করেছি আমি?" মাণিক ভয় পেয়ে চারিদিক দেখলেন। অফিস থেকে দাদার

বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে। ওঁর উদ্বেগ টের পেলো সতী, কয়েক মুহূর্ত অদ্ভুত চোখে তাকালো ওর দিকে তারপর বললো, "ভয় পেওনা মাণিক! আমি যাচ্ছি!" আর চোখের জল পুঁছে চলে গেল ধীরে-ধীরে।

সেসময়ে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধতো বৌদিতে আর মাণিকে কেননা দাদা-বৌদি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে মাণিকের এবার কোনও চাকরিতে লেগে যাওয়া উচিত। পড়াশুনার আর দরকার নেই। কিন্তু মাণিক আরও পড়তে চাইছিলেন। বৌদি একদিন দুকথা শোনালে বিষণ্ণ মাণিক এক বাগানে গিয়ে বটগাছতলায় বসে রইলেন বেঞ্চে আর ভাবতে লাগলেন কী করা যায় এবার।

কিছুক্ষণ পর কেউ ওঁকে ডাকতে দেখলেন সামনে সতী। একেবারে শান্ত, শবের মতন ফ্যাকাশে চেহারা, স্থির ভাবলেশহীন চোখ, এলো আর এসে পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়লো আর বললো, "যা চাইছিলে শেষপর্যন্ত তা হয়ে গেলো।"

মাণিক জানতে চাইলে ও বললো যে কাল রাত্তিরে চমন প্রামাণিকের সঙ্গে মহেশ্বর দালাল এলো। অনেক রাত ওব্দি দুজনে মিলে মদ খেলো। হঠাৎ মহেশ্বর দালালের কাছ থেকে মোটা টাকার বাণ্ডিল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো চমন প্রামাণিক আর মহেশ্বর এসে এমন সমস্ত কথাবার্তা কইতে লাগলো যা শুনে গা জ্বলে যাচ্ছিল সতীর আর সতী বাইরের দরোজার দিকে দৌড়ে দেখলো চমন বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে গেছে। তক্ষুনি নিজের ছুরি বের করেছিল সতী আর মহেশ্বর দালালকে একটা ধাক্কা দিতেই ডিগবাজি খেয়ে গেল মহেশ্বর। একে তো বুড়ো হাবড়া তায় নেশায় চুর আর সতী ওর গলায় ছুরি চেপে ধরতেই ওর নেশা একেবারে বেবাক উধাও আর বললে, "মেরে ফ্যাল আমায়, আমি টুঁ শব্দও করবো না। আমি হাত তুলবো না তোর ওপর। কিন্তু নগদ পাঁচশো টাকা দিয়েছি আমি। আমি ছেলেপুলের বাপ মরে যাবো একেবারে।" তারপর হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগলো আর একটা কাগজ দেখালো যাতে পাঁচশো টাকার চুক্তিতে চমন প্রামাণিক ওর কাছে সতীকে পাঠাবার সই দিয়েছিল আর মহেশ্বর কাঁদতে থাকলো আর সতীর যেন কেউ প্রাণ শুষে নিয়েছিল। হাত-পা টাটিয়ে উঠলো মহেশ্বরের। তারপর মহেশ্বর বোঝালো যে এখন তো আইনি কারবার হয়েই গেছে। এবার মহেশ্বর দালাল সুখে রাখবে ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু সতী শীতল শবদেহের মতন পড়ে রইলো। মহেশ্বর আর কী বলেছিল ওর মনে নেই, ওর মনে নেই কী ঘটেছে তারপর।

নিচের দিকে মুখ করে সতী চুপচাপ নখ দিয়ে আঁক কাটতে লাগলো মাটিতে তারপর মাণিকের দিকে তাকিয়ে বললে, "আজকে এই আংটিটা দিয়েছে মহেশ্বর।" মাণিক হাতে নিয়ে দেখতে হাসার চেষ্টা করে ও বললে, "আসল জিনিস।" মাণিক চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর সতী জানতে চাইলে মাণিক কেন এতো বিষণ্ণ

তো মাণিক জানালেন পড়াশুনা নিয়ে বৌদির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে তাইতে সতী তক্ষুনি নিজের আংটি বের করে মাণিকের হাতে রেখে দিলে আর বললো যে এই টাকায় ও ফিস জমা করে দিক। ভবিষ্যতের দায় ছেড়ে দিক সতীর জিম্মায়। মাণিক নিতে অস্বীকার করলে কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে সতী বললো, "আমি বুঝে গেছি। আর তুমি আমার কাছ থেকে কিছু নেবে না। কিন্তু আমি কী করবো বলে দাও আমাকে? আমাকে কেউতো বলছে না কিছু। আমি তোমার পায়ে পড়ছি। কোনও পথ আমাকে দেখাও। কোনও পথ—যা তুমি বলবে—আমি সবেতেই রাজি।" আর সত্যিই এতোক্ষণ পাথরের মতন নিষ্প্রাণ বসে-থাকা সতী পা ধরে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। মাণিক ঘাবড়ে উঠে দাঁড়াতে ও মাথা পেতে দিলে পায়ের ওপর আর এতো কাঁদলো যে বলবার নয়। কিন্তু মাণিক বললেন যে এবার ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। তো ও চুপচাপ উঠে দাঁড়ালো আর চলে গেলো।

আরেকবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আর সেদিনও বেশ বিষণ্ণ ছিল মাণিক কেননা জুলাই মাস এসে গিয়েছিল অথচ ভর্তির ব্যাপারটা পাকা হচ্ছিল না। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে মাণিককে টাকা দিল সতী যাতে ওঁর কাজ না থেমে যায় তারপর অনেক কাঁদলো ডুকরে-ডুকরে আর বললো যে ওর জীবন নরক হয়ে গেছে একেবারে। কেউ ওকে পথ দেখায় না। সান্ত্বনার একটা কথাও কইলেন না মাণিক মুল্লা, তো ও চুপ করে গেলো আর জানতে চাইলো যে মাণিকের খারাপ লাগেনি তো ওর কথা শুনে কেননা নিজের দুঃখের কথা বলার জন্যে মাণিক ছাড়া ওর আর কেউ নেই। আর কে জানে কেন মাণিকের কাছে কোনও কথা ও লুকোতে পারে না আর ওনাকে বলে ফেললে মন হালকা হয়ে যায় আর ওর মনে হয় যে অন্তত একজন মানুষ এমন আছে যার সামনে ওর আত্মা নিষ্পাপ আর নিষ্কলঙ্ক।

মাণিকের দৃষ্টিতে কোনও পথ ছিল না আর সত্যি বলতে কি দাদার কথাও সঠিক মনে হতো ওনার যে মাণিক আর এই লোকগুলোর মাঝে তুলনা হতে পারে না, দুজনের সমাজ আলাদা, মর্যাদা আলাদা, তবু মাণিক মুল্লা কিছু বলতেও পারছিলেন না সতীকে কেননা ওনাকে পড়াশুনাও চালিয়ে যেতে হবে, আর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ওনার লেখা গান গুলোতেও গভীর নিরাশা আর তিক্ততা ছেয়ে যাচ্ছিল।

আর তারপর অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো একদিন রাত্তির বেলায়। মাণিক মুল্লা ঘুমোচ্ছিলেন আর আচমকা কেউ ওনার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে দেখলেন সামনেই সতী! ওর হাতে ছুরি, ওর লম্বা-সরু গোলাপি আঙুলে ধরা ছুরিটা কাঁপছিল, মুখ উত্তেজনায় আরক্ত, নিরাশায় নীলাভ, ভয়ে বিবর্ণ। ওর কাঁকালে একটা পুঁটুলি

ছিল ছোট যাতে গয়না আর টাকা ছিল। মাণিকের পায়ে লুটিয়ে পড়ে সতী বললো, "চমন প্রামাণিকের কাছ থেকে কোনও রকমে ছাড়া পেয়ে এসেছি। ডুবে মরবো তবু ওখানে ফিরবো না। তুমি কোথাও নিয়ে চলো! কোথাও! আমি কাজ করবো। মজুরি খাটবো। তোমার ভরসায় চলে এসেছি।"

মাণিকের অবস্থা তখন এমন যে ওপরের শ্বাস ওপরে আর নিচের শ্বাস নিচে। কবিতা-টবিতা তো ঠিকই আছে কিন্তু এই ইল্লত মাণিক পুষবেন কোথায়! আর তারপর দাদা বলে কথা আর বৌদি তো তা থেকে পাঁচ-পা এগিয়ে। অত্যন্ত মিহিন এক সুতোয় ঝুলছিল মাণিকের সমগ্র অদৃষ্ট। হাজার হোক মাণিক মুল্লার মস্তিষ্ক। চকিতে ঢেউ খেলে গেলো। তক্ষুণি বললেন, "আচ্ছা সতী বোসো! আমি এখনই যাবো। তোমার সঙ্গে যাবো।" আর এদিকে পৌঁছে গেলেন দাদার কাছে। দুটো বাক্যে জানিয়ে দিলেন পরিস্থিতি। দাদা বললো, "ওকে বসিয়ে রাখ, আমি ডেকে আনছি চমনকে।" মাণিক গেলেন আর সতী যতো তাড়া লাগায় শিগগির বেরিয়ে পড়ার জন্যে নয়তো এসে পৌঁছোবে মহেশ্বর দালাল কিংবা চমন প্রামাণিক ততো কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে যান আর সতী যখন ছুরি ঝিকমিকিয়ে বললে, "যদি না যাও তো আজ হয় আমার প্রাণ যাবে নয়তো আর কারুর," মাণিকের সারা শরীর আমূল কেঁপে উঠলো আর মনে-মনে মাণিক দাদাকে স্মরণ করতে লাগলেন।

সতী ওনাকে জিজ্ঞেস করছিল, "কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে? কোথায় কাজ পাইয়ে দেবে? আমি একা থাকবো না!" সেই ফাঁকে এক হাতে লাঠি নিয়ে মহেশ্বর আর অন্য হাতে লণ্ঠন নিয়ে চমন প্রামাণিক এসে পৌঁছোলো আর পিছু-পিছু দাদা আর বৌদি। দেখা মাত্র সাপের মতন লাফিয়ে কোণের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লো সতী আর মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা আঁচ করে ছুরি খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাণিকের দিকে, "বিশ্বাসঘাতক! নীচ!" কিন্তু দাদা তক্ষুণি টেনে নিলে মাণিককে, মহেশ্বর জাপটে ধরলো সতীকে আর বৌদি চিৎকার করে পালালো।

ঘরের মধ্যেকার এর পরের দৃশ্য ভীতিকর। সতীকে কাবু করা যাচ্ছিল না, কিন্তু চমন প্রামাণিক যখন নিজের একমাত্র ফৌজি হাতের থাপ্পড় ঝাড়লে তো ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। ওই অবস্থায় সতীর ছুরি ওখানেই ছেড়ে গেলো আর ওর গয়নার পুঁটলিটাও কে জানে কোথায় গেলো। মাণিকের অনুমান যে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশে বৌদি ওটা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের সিন্দুকে রেখেছিল।

বেহুঁশ সতীকে চ্যাংদোলা করে দাদা আর মহেশ্বর ওকে ওর বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল আর মাণিক মুল্লা ভয়ে দাদার ঘরে শুয়েছিলেন।

পরের দিন চমন প্রামাণিকের দোরে বেশ ভিড় ছিল কেননা হাট করে পড়েছিল, জিনিশ-পত্তর ছড়ানো-ছেটানো, আর চমন প্রামাণিক আর সতী দুজনেই উধাও

আর যেসব বুড়িরা অনেক সকালে উঠে গঙ্গা স্নান করতে যায় তারা বলাবলি করছিল যে এদিক দিয়ে একটা টাঙা গিয়েছিল যাতে কিছু জিনিস-পত্তর ছিল। চমন প্রামাণিক বসেছিল আর সামনের সিটে শাদা চাদরে ঢাকা কেউ শুয়েছিল যেন মৃতদেহ।

লোকেরা বলাবলি করছিল যে চমন আর মহেশ্বর মিলে সতীর গলা টিপে মেরেছিল।

ষষ্ঠ দুপুর

ক্রমাগত

বিগত দুপুরের পরে

সতীর মৃত্যু মাণিক মুল্লার কচি ভাবুক কবি-হৃদয়ে অনেক গভীর ছাপ ফেলেছিল আর তার ফল হলো এই যে ওনার রচনায় বার বার শোনা যাচ্ছিল মৃত্যুর প্রতিধ্বনি।

ইতিমধ্যে ওনার দাদার বদলি হয়ে গেলো আর বৌদি সঙ্গে চলে গেলো আর বাড়ির দেখাশোনার ভার পড়লো মাণিকের ওপর। বাড়িতে একা অনেক ভয় করতো মাণিকের আর প্রায়ই মনে হতো যেন কঙ্কালদের ফাঁকা বাড়িতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওনাকে। পড়ার অভ্যাস ছিল কিন্তু এখন আর পড়তে মন বসতো না ওনার, পকেটও দাদা চলে যাবার পর একেবারে খালি থাকতো আর উনি এমন একটা চাকরি খুঁজছিলেন যাতে চাকরি করার সঙ্গে-সঙ্গে পড়াশুনাও বজায় থাকে। এই সমস্ত অবস্থা মিলেমিশে ওনার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল আর কে জানে কোন রহস্যময় আধ্যাত্মিক কারণে উনি সতীর মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করতে লাগলেন। ক্রমশ ওনার মানসিক অবস্থা এমন হয়ে গেলো যে পাড়া ছেড়ে এমন সমস্ত জায়গা ভালো লাগতে লাগলো যেমন বহুদূরে অশথ গাছের ছায়ায় একা, ভীতিকর ভাঙাচোরা গোরস্থান, পুরোনো শ্মশান, টিলা আর খাদ, এইসব। চাঁদের আলোকে মনে হতে লাগলো শবদেহের চাদর আর রোদ্দুরকে প্রেয়সীর চিতার আলো।

তখনও পর্যন্ত মাণিক মুল্লার সঙ্গে আমাদের এতোটা ঘনিষ্ঠতা হয় নি তাই এই ধরনের আড্ডা তেমন জমতো না আর সারা দিন টো-টো করে চায়ের ঠেকে প্রায়ই গিয়ে বসতেন মাণিক। চায়ের ঠেকের গুলতানিতে একটু মেজাজের মনোরঞ্জন হয়।

(কিন্তু একথাটা জানিয়ে দিই যে সতীর মৃত্যু সম্পর্কে মাণিক মুল্লার ধারণা একেবারে ভুল ছিল। সতী কেবল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল আর অমন অবস্থাতেই চমন প্রামাণিক নিয়ে গিয়েছিল ওকে কেননা বদনাম হবার ভয়ে মহেশ্বর দালাল চাইছিল না যে এক মুহূর্তের জন্যেও ওরা পাড়ায় থাকুক। কিন্তু সতী কোথায় ছিল তা মাণিক মুল্লা পরে জানতে পারেন।)

এদিকে মাণিক মুল্লা ঠিক করে নিয়েছিলেন যে যদি ওনার জন্যে সতীর জীবন নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তো উনিও সব রকম ভাবে নিজের জীবন নষ্ট করে ছাড়বেন

যেমন শরতের দেবদাসরা করেছিল আর তাই জীবন নষ্ট করার যতোগুলো উপায় ছিল, উনি সেগুলো কাজে লাগাচ্ছিলেন। ওনার স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ওনার স্বভাব বেশ অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খল আর আত্মঘাতী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু উনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন কেননা উনি সতীর মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন। ওনার আত্মায়, ওনার ব্যক্তিত্বে আর ওনার প্রতিভায় অভিশাপ লেগেছিল এবং অভিশপ্ত অবস্থায় আর কী-ই বা করা যায়।

বন্ধুবান্ধবরা প্রায়ই ওনাকে বোঝাতো যে মানুষের উচিত জীবনের প্রতি আস্থা রাখা। মৃত্যু সম্পর্কে এরকম মোহতো কাপুরুষতা আর বিক্ষেপ বই কিছু নয়, ওনার পথ পালটানো দরকার, কিন্তু তাতে উনি মনে করতেন যে কর্তব্য-পথ থেকে বিচলিত হয়ে যাচ্ছেন। আর ওনার কর্তব্য তো মৃত্যুর রাস্তায় অদম্য সাহসে এগিয়ে যাওয়া। এমন চিন্তা এলেই উনি কচ্ছপের মতন গুটিয়ে অন্তর্মুখ হয়ে যেতেন। ক্রমে ক্রমে ওনার অবস্থা হয়ে গেলো সেই স্থিতপ্রজ্ঞের মতন যাঁর দৃষ্টিতে সুখ-দুঃখ আলো-অন্ধকার, সত্য আর মিথ্যার ভেদাভেদ লোপ পেয়েছে, যিনি সময় এবং দিকের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীতে বদ্ধ জীবসমূহের মধ্যে জীবন্মুক্ত আত্মার মতন বিচরণ করেন। সামাজিক জীবন ওনাকে বারংবার নিজের শৃঙ্খলে বাঁধার চেষ্টা করতো কিন্তু উনি প্রেম ছাড়া সমস্ত জিনিসকে নিঃসার মনে করতেন তা সে আর্থিক প্রশ্ন হোক, বা রাজনৈতিক আন্দোলন, মোতিহারির আকাল হোক, বা কোরিয়ার যুদ্ধ, শান্তির জন্যে আবেদন হোক কিংবা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। কেবলমাত্র প্রেমই সত্য, প্রেম যা কিনা রস, রস-ই ব্রহ্ম—(রসো বৈ সঃ—বৃহদারণ্যক দেখুন—)।

স্বস্বীকৃত এই মরণাবস্থা থেকে হলো এই যে ওনার গানে অতীব করুণা, দরদ আর নিরাশা ছেয়ে গেলো আর যেহেতু এই প্রজন্মের প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে কোথাও মাণিক মুল্লা আর দেবদাসের অংশ থাকে তাই সবাই মাতোয়ারা হয়ে যেতো। যদিও তারা সবাই অধিকতর চতুর, মৃত্যুসঙ্গীতের প্রশংসার পর যে যার কাজে লেগে যেতো কিন্তু মাণিক মুল্লা নিশ্চই তেমন অনুভব করতেন যেমন বাসাহীন ডানাভাঙা চকোরপাখি যে চাঁদের কাছে পৌঁছোতে-পৌঁছোতে খসে যায় আর নেমে আসে, আর বাতাসের মিহিন ঝাপটের আঘাতে হয়ে যায় পথভ্রষ্ট। আসলে তার কোনও উদ্দেশ্য নেই, পথ নেই, লক্ষ্য নেই, চেষ্টা নেই আর প্রগতি নেই কেননা পতনকে, অধঃপতনকে তো আর প্রগতি বলা যায় না!

এই জায়গাটায় আমি মাণিক মুল্লাকে জিজ্ঞেস করলুম যে এরকম একটা অবস্থায় শেষাশেষি আপনার ক্লান্ত লাগতো না? উনি বললেন (শব্দ আমার, বক্তব্য ওনার) যে, 'কেন ক্লান্তি আসবে না? প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে আমি এমন কাজকর্ম করতুম যে চমকে উঠতুম নিজেই আর অন্যেরাও চমকে উঠতো। যার মাধ্যমে আমি নিজেকে

আশ্বস্ত করতুম যে আমি বেঁচে আছি, আমি ক্রিয়াশীল। যেমন, বলছি কিছু, বলতে-বলতে করে ফেললুম অন্য কিছু। সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা একে মিথ্যে বলা বা ছল করা নামে অভিহিত করতে পারে। কিন্তু এসমস্ত ছিল অন্য লোকেদের ভেলকি দেখাবার জন্যে, নিজের উৎকণ্ঠায় ক্লান্তির দরুণ। ঝাঁঝালো কথাবার্তা বলা, তাবৎ অনুশাসনকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা, এগুলো আমার মনের সেই প্রবৃত্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল যা প্রকৃতপক্ষে আমার ভেতরের জড়তা আর শূন্যতার পরিণাম।

কিন্তু আমরা যখন জানতে চাইলুম যে এই ব্যাপারগুলো থেকে কী তৃপ্তিই বা তিনি পেতেন তো উনি বললেন, "আমি বোধ করতুম যে আমি অন্য সবায়ের থেকে আলাদা, আমার ব্যক্তিত্ব অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় আর সমাজ আমাকে বুঝতে পারে না। সাধারণ মানুষরা খুবই সাধারণ, আমার প্রতিভার স্তর থেকে অনেক নিচে, আমি যেমন ইচ্ছে তাদের বিভ্রান্ত করতে পারি। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি এক অনাবশ্যক মোহ, তার বিকৃতিকে প্রতিভার তেজোময়তা মনে করার ভ্রম আর নিজের অসামাজিকতাকেও নিজের সততা মনে করার দম্ভ এসে গিয়েছিল আমার মধ্যে। ক্রমে-ক্রমে আমি নিজেকেই এতো ভালোবাসতে লাগলুম যে আমার মনের চারপাশে তৈরি হয়ে গেলো উঁচু-উঁচু দেয়াল আর আমি নিজে বন্দী হয়ে গেলুম নিজের অহংকারের, কিন্তু আমার ওপর এই নেশার প্রভাব এতো তীব্র ছিল যে আমি কখনও নিজের প্রকৃত অবস্থা টের পাইনি।"

"তো এই মনস্থিতি থেকে কী ভাবে আপনি মুক্ত হলেন?"

"সত্যি বলতে কি একদিন বড়োই বিচিত্র এক পরিস্থিতিতে আমার কাছে এই রহস্যের উদঘাটন হলো যে সতী বেঁচে আছে আর এখন ওর মনে আমার প্রতি ভালোবাসার বদলে রয়েছে তীব্র ঘৃণা। তা জানতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে সতীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আমি নিজের ব্যক্তিত্বের চারধারে মিথ্যের যে টানাপোড়েন বুনে রেখছিলুম তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো আর আমি আবার একজন সুস্থ সাধারণ মানুষের মতন হয়ে গেলুম।"

তারপর উনি সেই ঘটনাটা বললেনঃ

যে সমস্ত চায়ের ঠেকে উনি যেতেন তার ধারেকাছে ভিখিরিরা ঘুরঘুর করতো। উনি চা খেয়ে বেরোতেই ছেঁকে ধরতো ভিখিরিগুলো।

একদিন উনি এক নতুন ভিখিরিকে দেখতে পেলেন। একটা ছোট্ট কাঠের ঠেলায় বসেছিল। তার একটা হাত কাটা ছিল আর একজন মেয়েমানুষ কোলে একটা ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চা নিয়ে টেনে আনছিল গাড়িটা। ও এসে দাঁড়ালো মাণিকের কাছে আর হলদেটে দাঁত বের করে কিছু বললো তখন মাণিক স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে ভিখিরিটা তো চমন প্রামাণিক আর এ তো সতী। কাছ থেকে মাণিককে দেখতে পেয়ে কয়েক পা পেছিয়ে গেল সতী, হাত দ্রুত চলে গেলো কোমরে—বোধহয়

ছুরির খোঁজে, কিন্তু ছুরি না পেয়ে ও চায়ের কাপ তুলে নিলো আর রক্তপায়ী দৃষ্টিতে মাণিকের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো।

সতী বেঁচে আছে আর ছেলেপুলে নিয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে দেখে মাণিকের মন থেকে নিরাশা উবে গেলো আর উনি নতুন জীবন ফিরে পেলেন আর দিনকতক পর তান্নার জায়গা খালি হতে কবিতা-গল্প ছেড়ে-ছুড়ে, আর. এম. এস-এ চাকরি পেলেন আর সুখে থাকতে লাগলেন। (মাণিক মুল্লার ভালো দিন যেমন ফিরে এলো ঠাকুর করুন সবায়ের ফিরুক।) এরই কিছুকাল পর মাণিক মুল্লার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হলো আর আমাদের আড্ডা বসতে লাগলো ওনার বাসায়।

নিষিদ্ধ পাঠ

যদিও আমার হজম শক্তি খুব ভালো আর আমি দান্তের ডিভাইন কমেডি পড়িনি তবু আমি একটা স্বপ্ন দেখছি।

চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোবার মতন একটা সাতরঙা রামধনু জন্ম নিচ্ছে। আকাশের মাঝখানে এসে সেই রামধনু ঝুলে রইলো।

একটা জ্বলন্ত ঠোঁট, কম্পমান—ডানদিক থেকে ভেসে চলেছে রামধনুর পানে।

একটা জ্বলন্ত ঠোঁট, কম্পমান—বাঁদিক থেকে ভেসে চলেছে রামধনুর পানে।

ডানদিকে মাণিকের ঠোঁট, বাঁদিকে লীলার। ভাসতে-ভাসতে রামধনুর কাছে দুটিই থেমে যায়।

নিচে ধরাতলে একটা গাড়ি টানতে-টানতে পৌঁছোয় মহেশ্বর দালাল। চমন প্রামাণিকের ভিক্ষা করার গাড়ি সেটা। ছোট-ছোট বাচ্চা বসে আছে তাতে। যমুনার বাচ্চা, তান্নার বাচ্চা, সতীর বাচ্চা। অন্ধ অজগরের মতন এগিয়ে আসে চমন প্রামাণিকের কাটা হাত। বাচ্চাদের গলায় জড়িয়ে যায়, টুঁটি টিপে ধরে। তাদের দম বন্ধ হতে থাকে।

রামধনুর দুদিকের তৃষিত ঠোঁট আরও কাছে আসে।

রাক্ষসের মতন নাচতে-নাচতে এগিয়ে আসে তান্নার দুই কাটা পা। তাতে লোহার নতুন নাল বসানো। তাতে পিষে চাপা পড়ে বাচ্চাগুলো। সবুজ ঘাস—বহুদূর পর্যন্ত তার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে সাইকেলে চাপা-পড়া লাল পোকা। রক্ত জমাট বেঁধে গাঢ় কালো হয়ে গেছে। পাহাড় আর সমতলভূমি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে রামধনুর হেলানো ছায়া।

মায়েরা ফুঁপিয়ে ওঠে। যমুনা, লিলি, সতী।

দুই ঠোঁট আরও এগিয়ে যায় রামধনুর কাছে—আরও কাছে—আরও কাছে।

একটা কালো ছুরি রামধনুকে দড়ির মতন কেটে দেয়। মাংসপিণ্ডের মতন ছিটকে পড়ে দুই ঠোঁট।

চিল...চিল...চিল...পঙ্গপালের মতন অজস্র চিল!

সপ্তম দুপুর

সূর্যের সপ্তম অশ্ব

অর্থাৎ যে স্বপ্ন পাঠায়

পরের দিন আমি গেলুম আর মাণিক মুল্লাকে বললুম যে আমি এই স্বপ্ন দেখেছি তো উনি খিঁচিয়ে উঠলেন : "দেখেছো তো আমার তাতে কী? যখনই দেখো তখন 'স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি!' আরে কী এমন বাঘ সিংহ দেখেছো যে গান গেয়ে বেড়াচ্ছো!" আমি চুপ করে যেতে মাণিক মুল্লা উঠে আমার কাছে এলেন আর সান্ত্বনা দেবার কণ্ঠস্বরে বললেন, "এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখো তুমি?" বললুম, "হ্যাঁ", তাইতে বললেন, "তার মানে প্রকৃতি তোমায় বিশেষ কাজের জন্যে বেছে নিয়েছে! বাস্তব জীবনের বহুবিধ মাত্রাকে, অনেক ব্যাপারের পারস্পরিক সম্বন্ধকে আর তাদের গুরুত্বকে তুমি স্বপ্নের মাঝে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখবে, যেখান থেকে অন্যেরা দেখতে পাবে না আর তারপর স্বপ্নগুলো তুমি সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরবে সবায়ের সামনে। বুঝলে?" আমি মাথা নাড়লুম যে হ্যাঁ আমি বুঝে গেছি তো উনি আবার বললেন, "আর জানো কি যে এই স্বপ্নগুলো সূর্যের সপ্তম অশ্বের পাঠানো!"

যখন আমি জিজ্ঞেস করলুম যে সে আবার কী জিনিস তো বাদবাকি সবাই অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো, সেসব আমি না হয় পরে জেনে নেবো আর মাণিক মুল্লাকে গল্প শোনাবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলো।

মাণিক মুল্লা আরও গল্প শোনাতে অস্বীকার করলেন আর বললেন, 'এরকম লাগাতার ভাবে এতোগুলো প্রেমের গল্প যথেষ্ট। সত্যি বলতে কি এতোগুলো মানুষের জীবন নিয়ে উনি একটা পুরো উপন্যাস শুনিয়ে দিলেন। কেবল তার রূপটুকু রাখলেন গল্পের যাতে প্রত্যেক দুপুরে আমাদের আগ্রহ বজায় থাকে আর আমরা ক্লান্ত হয়ে না যাই। নইলে বলতে গেলে এটা তো একটা উপন্যাসই আর এমন ভাবে বলা হলো যাতে যাঁরা মিলনান্তক উপন্যাস ভালোবাসেন তাঁরা যমুনার সুখী বৈধব্যে প্রসন্ন হবেন, স্বর্গে তান্না আর যমুনার মিলনে প্রসন্ন হবেন, লিলির বিয়েতে প্রসন্ন হবেন, আর ছুরি থেকে মাণিক মুল্লার প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় প্রসন্ন হবেন, আর যাঁরা বিয়োগান্তক ভালোবাসেন তাঁরা সতীর ভিখিরি জীবনে দুঃখী হবেন, তান্নার ট্রেন-দুর্ঘটনায় দুঃখী হবেন, লিলি আর মাণিক মুল্লার অনন্ত বিরহে দুঃখী হবেন। সেই সঙ্গে মাণিক মুল্লা আমাদের বোঝালেন যে যদিও এগুলোকে প্রেমের

গল্প বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে এগুলো 'না-প্রেমের' গল্প, যেমন উপনিষদে এই ব্রহ্ম নেই, নেতি-নেতি বলে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরুপণ করা হয়েছে ঠিক তেমনিই এই গল্পগুলোয়, 'এ প্রেম ছিল না, এও প্রেম ছিল না, এও প্রেম ছিল না' বলে-বলে প্রেমের ব্যাখ্যা আর সামাজিক জীবনে তার স্থান নিরূপণ করা হয়েছিল। 'সামাজিক জীবন' উচ্চারণ করার সময় মাণিক মুল্লা কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাকে সতর্ক করলেন আর বললেন, 'তুমি বড্ডো স্বপ্নে আসক্ত আর তোমার তো একথাটা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, যে-প্রেম সমাজের প্রগতি আর ব্যক্তির উন্নতির সহায়ক নয় তা নিরর্থক। এটাই সত্য। এছাড়া গল্পকাহিনীতে প্রেমের বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, কবিতায় যা-কিছু লেখা হয়েছে, পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছে, সে সমস্ত রঙিন মিথ্যা বই আর কিছু নয়। তারপর উনি এ-ও বল্লেন যে উনি সবার আগে প্রেমের গল্প এই জন্যে শোনালেন যে এই রোমান্টিক বিভ্রম আমাদের মস্তিষ্কে এমন বিশ্রি ভাবে ছেয়ে আছে যে এ ছাড়া আমরা অন্য কিছু আর শুনতে চাই না। (পরে উনি আরও বিভিন্ন আঙ্গিকে উপন্যাস শুনিয়েছেন যেগুলো সময় পেলে লিখবো, তার আগে এই ফাঁকে গল্পগুলো সম্পর্কে মাণিক মুল্লার প্রতিক্রিয়া জেনে নিই।)

কাহিনীগুলোর ক্রমপর্যায় সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ দিতে গিয়ে উনি বললেন যে সাতটা দুপুর পর্যন্ত প্রসারিত এই অনুক্রম অনেকটা ধার্মিক পাঠচক্রের মতন যাতে কোনও সাধুসন্তের প্রবচন কিংবা ধর্মগ্রন্থের সপ্তাহকাল-ব্যাপী আলোচনা হয় আর প্রতিদিন উনি আমাদের একটা গল্প শোনালেন আর শেষকালে নিষ্কর্ষ জানালেন (যদিও এটা আংশিক সত্য কেননা গল্পগুলোর উনি নিষ্কর্ষ বলেনই নি!) মাণিক-গল্পচক্রের দিনের সংখ্যা সাত রাখার কারণও সম্ভবত সূর্যের সাতটা ঘোড়ার ওপর নির্ভরশীল।

শেষকালে আমি আবার জানতে চাইলুম যে সূর্যের সাত ঘোড়ার তাৎপর্য কী আর স্বপ্নেরা সূর্যের সপ্তম ঘোড়ার সঙ্গে কী ভাবে সম্পর্কিত তো উনি বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন যে, দেখো প্রকৃতপক্ষে এই গল্পগুলো প্রেম নয় বরং সেই জীবনকে আঁকে যা আজকের নিম্ন-মধ্যবিত্তরা অতিবাহিত করছে। তাতে প্রেমের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে আজকের আর্থিক সংঘর্ষ, নৈতিক বিশৃঙ্খলা, তাই এতো অনাচার, নিরাশা, তিক্ততা আর অন্ধকার ছেয়ে গেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর। কিন্তু এমন কোনও ব্যাপার নিশ্চই আছে যা আমাদের সর্বদা অন্ধকার ভেদ করে এগোবার, সমাজব্যবস্থাকে বদলাবার আর মানবতার সাধারণ মূল্যবোধকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার সাহস আর প্রেরণা যুগিয়েছে। ইচ্ছে হলে তাকে আত্মা বলতে পারো বা অন্য কিছু। এবং বিশ্বাস, সাহস, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা সেই আলোকবাহী আত্মাকে ঠিক সেভাবেই এগিয়ে নিয়ে চলে যেমন ভাবে সাতটা ঘোড়া সূর্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বলাও হয়েছে, "সূর্য আত্মা জগতস্ত স্থুষশ্চ।"

তো প্রকৃতপক্ষে সূর্যের রথকে এগোতেই হবে। অথচ আমাদের শ্রেণী-বিভাজিত, অনৈতিক, ভ্রষ্ট আর অন্ধকার জীবনের গলিতে চলার ফলে সূর্যের রথ বেশ ভেঙেচুরে গেছে আর বেচারা ঘোড়াদের তো অবস্থা এমন যে কারুর লেজ কেটে গেছে তো কারুর ঠ্যাঙ ভেঙে গেছে, তো কেউ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে, তো কারুর খুর জখন হয়ে গেছে। এখন বেঁচে আছে কেবল একটাই ঘোড়া যার ডানা অক্ষত রয়েছে, যে বুক ফুলিয়ে গ্রীবা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে। সেই ঘোড়া হলো ভবিষ্যতের ঘোড়া, তান্না, যমুনা আর সতীর কচি নিষ্পাপ শিশুদের ঘোড়া ; যাদের জীবন আমাদের জীবনের থেকে অধিকতর শান্তিময় হবে, অধিকতর পবিত্র হবে, তাতে থাকবে অধিকতর আলো, থাকবে অধিকতর অমৃত। সেই সপ্তম অশ্বই আমাদের চোখের পাতায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর বর্তমানের নবীন নকশা পাঠায় যাতে আমরা সেই পথ গড়তে পারি যার ওপর দিয়ে আসবে ভবিষ্যতের ঘোড়া ; যাতে তারা লিখতে পারে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় যার ওপর দিয়ে ছুটবে অশ্বমেধের দিগ্বিজয়ী ঘোড়া। মাণিক মুল্লা একথাও বললেন যে যদিও বাদবাকি ছটা ঘোড়া দুর্বল, রক্তহীন আর বিকলাঙ্গ কিন্তু সপ্তম ঘোড়াটা তেজস্বী আর শৌর্যবান আর আমাদের দৃষ্টি আর আমাদের আস্থা তার ওপরেই থাকা উচিত।

মাণিক মুল্লা এই কথাটাই মনে রেখে মাণিক গল্প-চক্রের এই প্রথম ধারাবাহিকের নাম 'সূর্যের সপ্তম অশ্ব' রেখেছিলেন। এই নাম আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে তাই আমি স্বীকার করে নিয়েছি যে নামটা আমার দেয়া নয়।

সবশেষে আমি খোলোশা করে দিই যে এই ছোট উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যা কিছু ভালোমন্দ আছে তার দায় আমার ওপর নয়, মাণিক মুল্লার ওপরই বর্তায়। আমি কেবল নিজের মতন করে সেই গল্প রেখেছি আপনাদের সামনে। মুল্লা এবং তাঁর গল্পকৃতি সম্পর্কে এবার আপনি আপনার মতামত গড়ার জন্যে স্বাধীন।

Lasertypeset at The Excutive Printer, 29A, Baithakkhana Road, Calcutta-700009
Printed at India International Press, Naraina, New Delhi-28